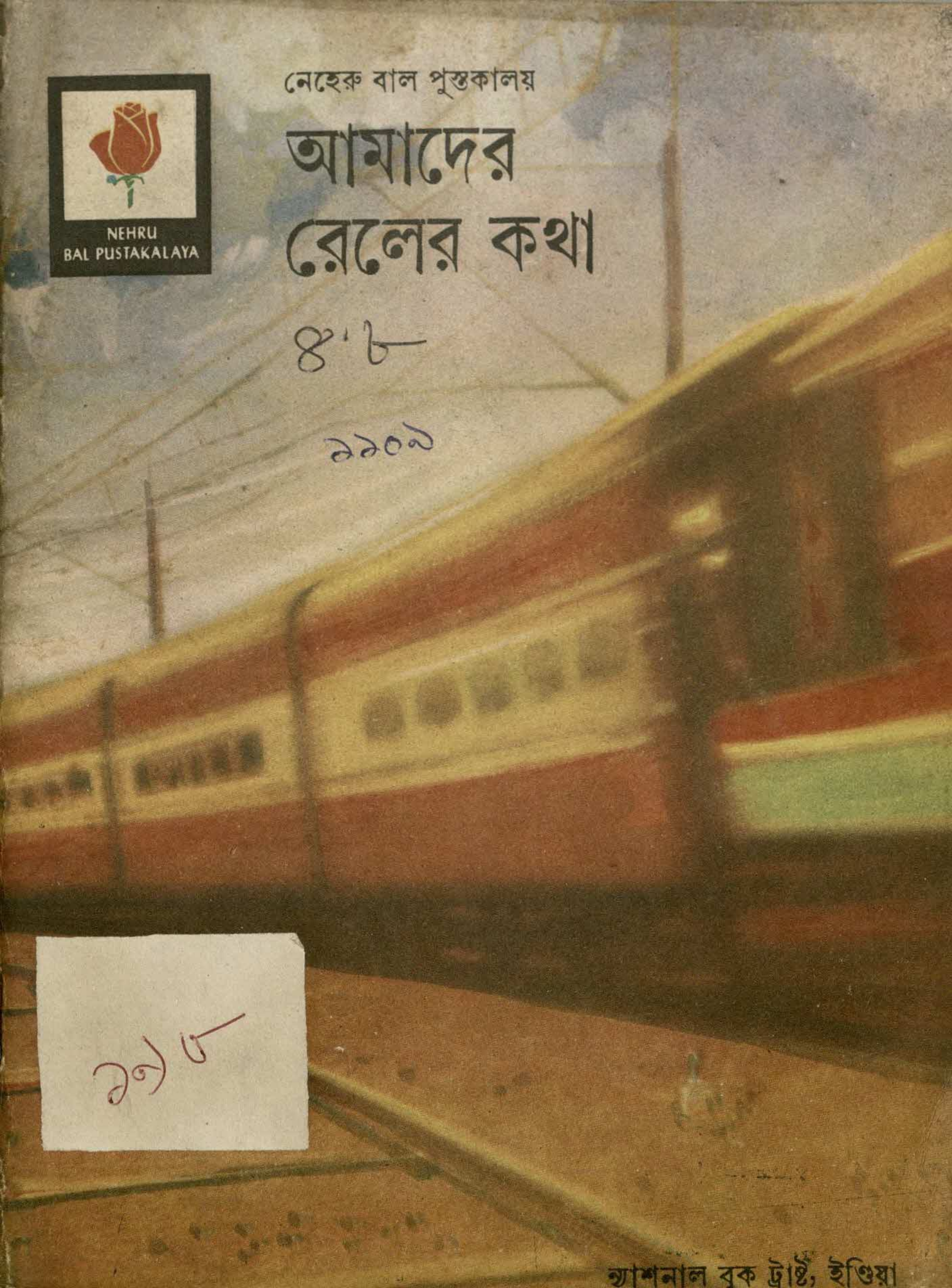


NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

নেহেরু বাল পুস্তকালয়

আমাদের রেলের কথা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া



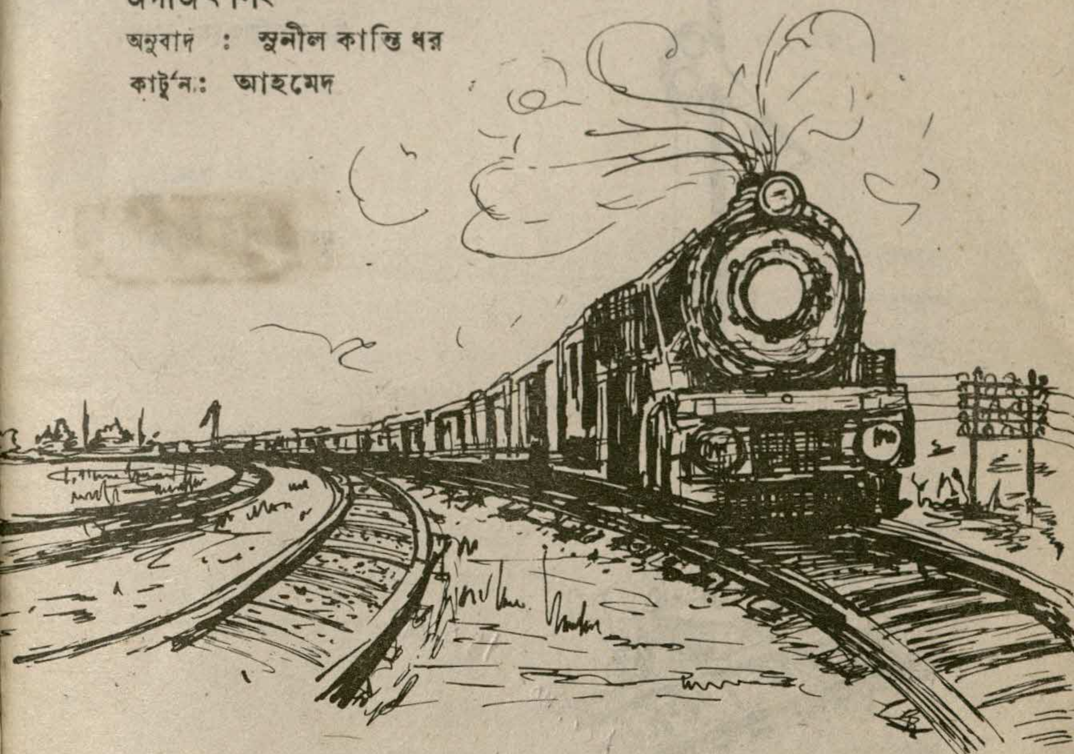
নেহেরু বাল পুস্তকালয়—৯

আমাদের রেলের কথা

জগজিৎ সিং

অনুবাদ : সুনীল কান্তি ধর

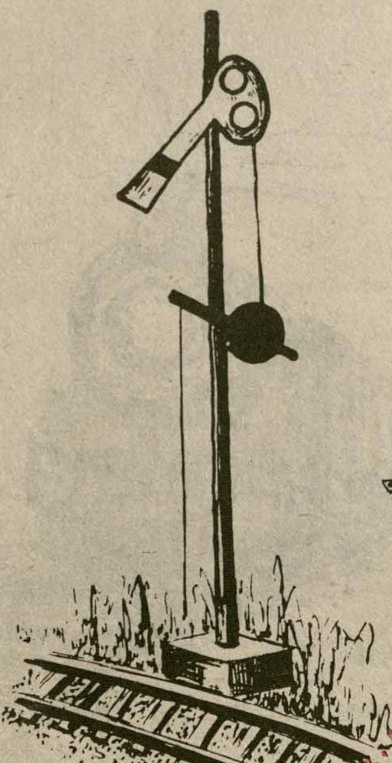
কার্টুন: আহমেদ



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নিউ দিল্লী

ডিসেম্বর ১৯৭১ (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৮৯৩)
দ্বিতীয় সংস্করণ : 1983 (শক 1905)



আলোকচিত্র : রেলওয়ে বোর্ডের সৌজন্যে

Published by Director, National Book Trust, India, A-5, Green Park, New Delhi 110016 and printed by Gautam Packaging, B-29, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi 110020



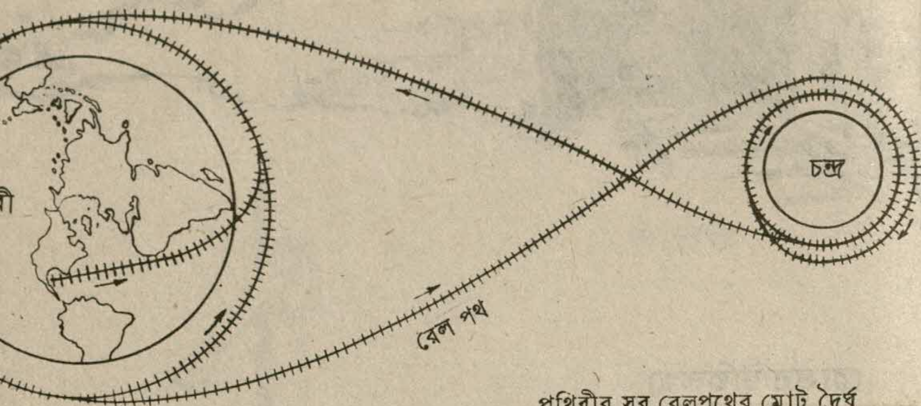
রেলের ইতিকথা

রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই মানুষ রেল লাইনের ব্যবহার জানতো। অসমতল রাস্তার চাইতে মসৃণ লাইনের ওপর দিয়ে ভারী জিনিষ সহজে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই বহুদিন আগে কয়লা খনির মালিকেরা কাঠের লাইন পেতে তার ওপর দিয়ে ঘোড়ায় টানা চাকাওয়ালা গাড়ীতে কয়লা বয়ে নিয়ে যেতো।

অনেকেই হয়তো জানো, স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার জেমস্ ওয়াট ছেলেবেলায় ফুটন্ত জলের বাষ্পের চাপে কেটলীর ঢাক্না উঠতে-নামতে দেখে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের প্রেরণা পান। এই বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন দিয়ে প্রথম রেলগাড়ী চালানো হয়।

এইদিন পৃথিবীতে রেলগাড়ী ছিল না, একথা আজকাল যেন আমরা ভাবতেও পারি না। আর আজ রেল আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অথচ দেড়শ' বছর আগেও এমন ছিল না। রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয় ইংলণ্ডে। ১৮২৫ সালের আগে সেখানেও রেলওয়ে ছিল না।

গত দেড়শ' বছরে রেলপথের অনেক প্রসার হয়েছে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১২,৩২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশী রেলপথ। সম্প্রতি



পৃথিবীর সব রেলপথের মোট দৈর্ঘ
চন্দ্রাভিযানের দূরত্বের চাইতে বেশী

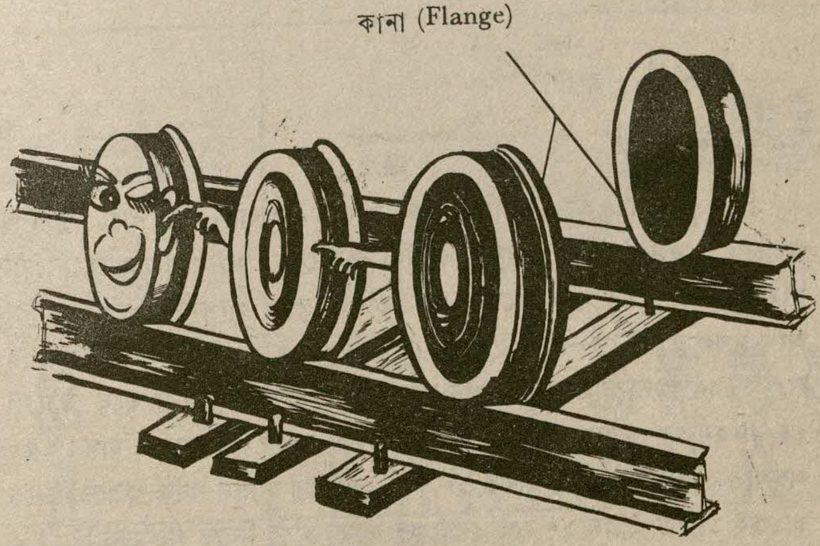
আমেরিকার চাঁদে যেতেও এতটা দূরত্ব পেরোতে হয়নি। এক বছরে পৃথিবীর সমস্ত ট্রেন মিলে যত মাইল চলে তাতে সূর্য থেকে সৌরমণ্ডলের সব চাইতে দূরের গ্রহ প্লুটো অবধি গিয়ে ফিরে আসা যায়।

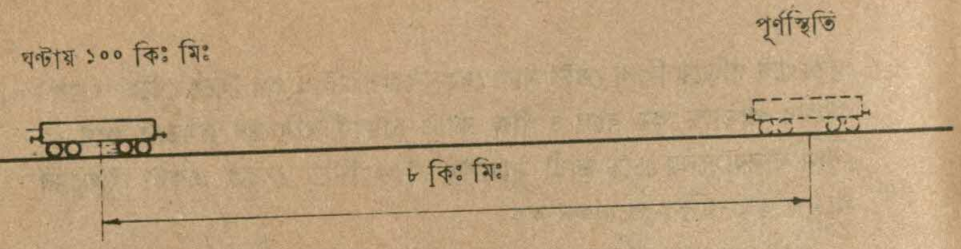
সব চাইতে সুলভ স্থলযান বলেই রেল ব্যবস্থার এত দ্রুত প্রসার সম্ভব হয়েছে।

রেল পরিবহণ অপেক্ষাকৃত সুলভ, কারণ তার বিশেষ ধরনের লাইন ও চাকা। রেলগাড়ীর চাকা একদিকে খাঁজ কাটা। চাকার ভিতর দিকে একটা কানা বা রিম (rim)। এর সাহায্যে চাকাগুলি লাইন আঁকড়ে ধরে চলে। তাছাড়া দিক পরিবর্তনের জন্যে স্টিয়ারিঙেরও প্রয়োজন হয় না। মসৃণ রেল লাইন ও লোহার চাকার ভেতরে ঘর্ষণের প্রতিবন্ধ (resistance) ট্রাকের রবারের চাকা ও রাস্তার ঘর্ষণের প্রতিবন্ধের চেয়ে অনেক কম। যদি একটা ট্রেনকে সমতল রেল লাইনের ওপর ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ঠেলে দেওয়া হয় তাহলে সেটা থামবার আগে ৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে। কিন্তু একটা মালবাহী ট্রাককে রাস্তার ওপর একই

গতিবেগে গড়িয়ে দিলে সেটা মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ গিয়ে থেমে যাবে। ঘর্ষণের প্রতিবন্ধ কম বলে ও খাঁজ কাটা চাকার স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার গুণে যে কোন যানবাহনের চেয়ে ভারী মালপত্র টেনে নিয়ে যেতে একটা ইঞ্জিনের অনেক কম শক্তির প্রয়োজন হয়।

তাই অনেক বেশী মালপত্র বহন করলেও ট্রাকের চাইতে ট্রেনে অনেক কম জ্বালানীর (fuel) প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৪-৬৫ সালে অন্য সমস্ত যানবাহনে রেলের আট গুণ জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এরা সবাই মিলে রেলের এক পঞ্চমাংশ মালপত্র বহন করেছে। তাছাড়া একই পরিমাণ মালপত্র বইতে অন্য সব যানবাহন সংস্থায় রেলের চেয়ে নয় গুণ বেশী কর্মীর প্রয়োজন হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, রেল সব চাইতে সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা।





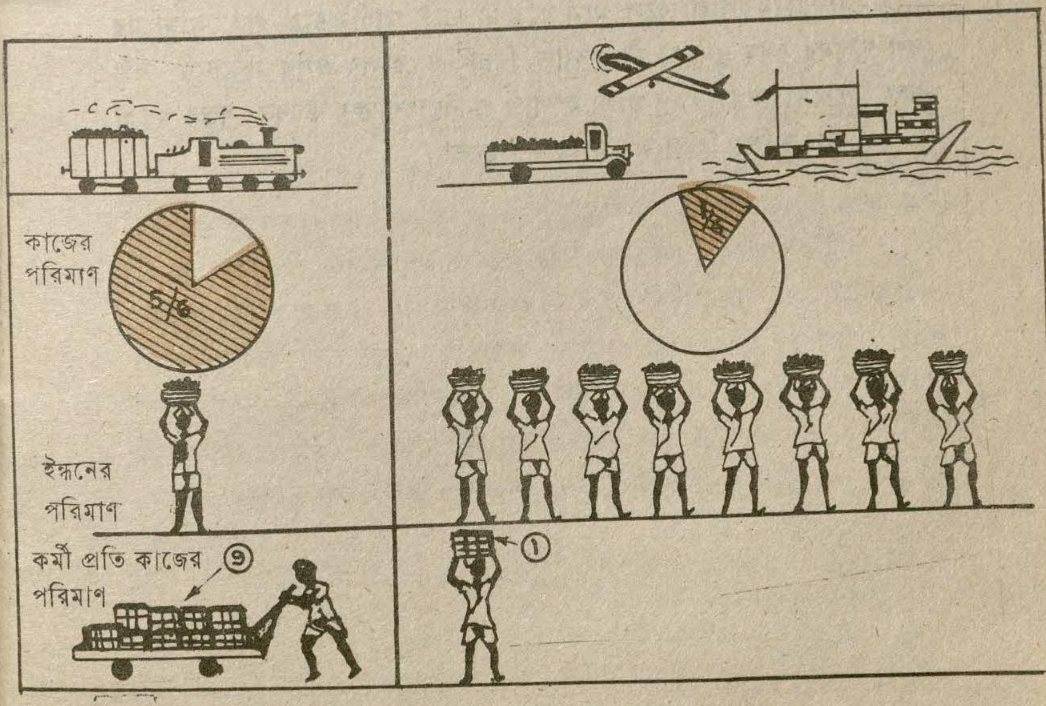


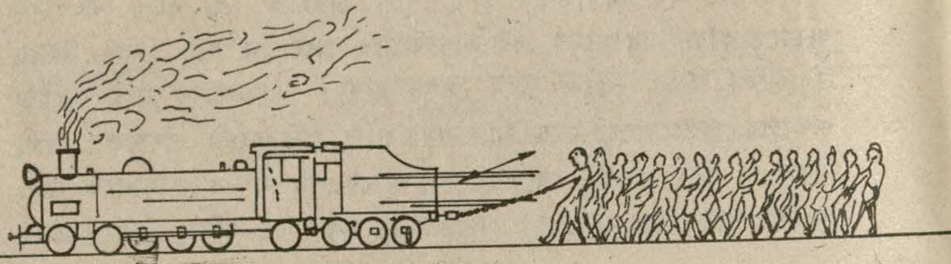
শিল্প বিপ্লবের দ্রুত প্রগতির মূলে রয়েছে রেলের স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণ ক্ষমতা। দেড়শ' বছর আগে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ভারত তথা পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ দখল করার যে শক্তি ইংলণ্ড পেয়েছিল, তার মূলে এই আবিষ্কার। ইংলণ্ড যেন রাতারাতি এক বিরাট যান্ত্রিক বাহিনীর অধিকারী হয়ে উঠলো। এই বাহিনীকে খেতে পরতে না দিলেও চলে অথচ খাটানো যায়। ৫০০ অশ্বশক্তির একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন ১০,০০০ লোকের সমান কাজ করতে পারে। কাজেই ১০০টি ইঞ্জিন ১০ লক্ষ লোকের কাজ ক'রে দিতে লাগলো।

শুরুতে এই যন্ত্রশক্তিকে তাঁত শিল্পে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদন বাড়াতে কারখানায় অনেক বেশী কাঁচামালের প্রয়োজন হতো আর উৎপন্ন দ্রব্যগুলো বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হতো। কারখানার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের জন্যে উন্নত অথচ সুলভ পরিবহণের প্রয়োজন দেখা দিলো। এর থেকেই রেলের সৃষ্টি। রেলপথ মানব সভ্যতাকে দ্রুত প্রগতির পথে নিয়ে চললো। পর্বতপ্রমাণ কয়লা ও খনিজ দ্রব্য বহনের

রেল পরিবহণ

জল, স্থল ও বিমান পরিবহণ





৫০০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন বনাম ১০,০০০ মানুষ

উপযোগী রেলওয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য মূল শিল্পের অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ালো।

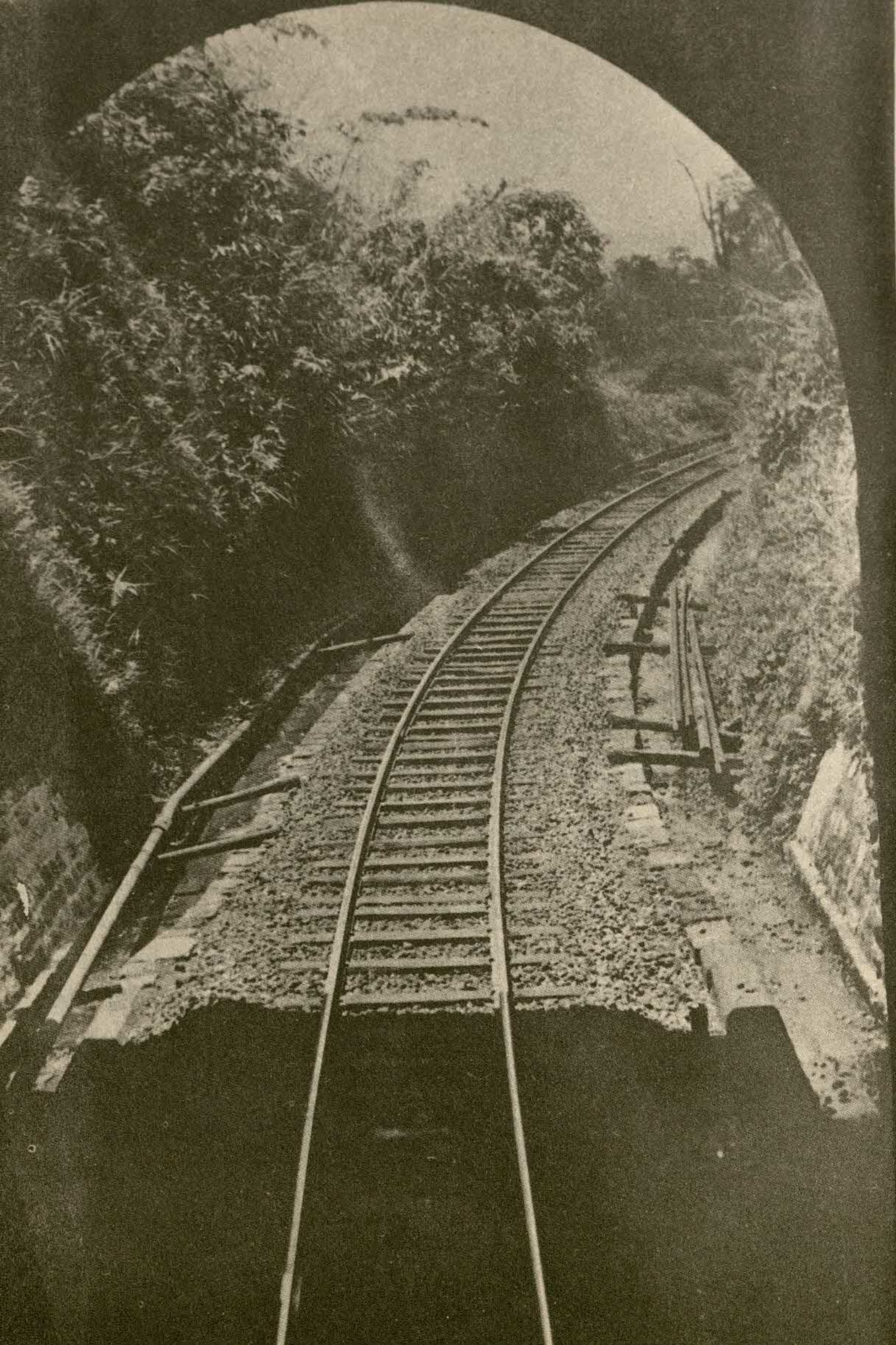
পৃথিবীতে যে দেশ সবচেয়ে বেশী ইস্পাত ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করে তাকে আমরা বিত্তশালী বলে মনে করি। তাই স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ গঠনের সময় নেহেরুজী ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও রেলের ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রেল ছাড়া ইস্পাত ও বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়ন সম্ভব হতো না এবং ভারত শিল্প বিজ্ঞানেও পিছিয়ে পড়তো।

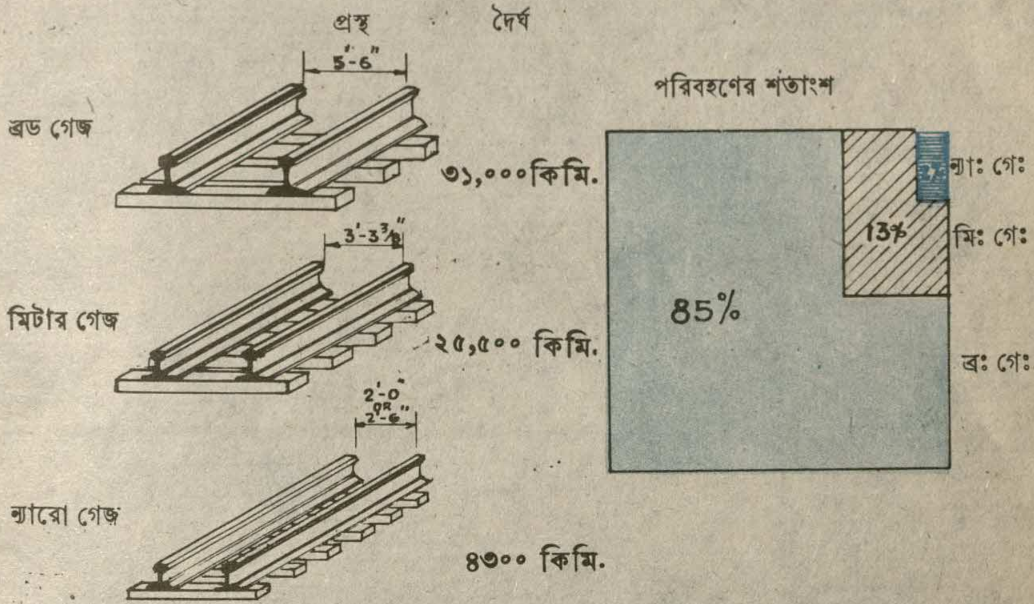
রেলপথ ও আকর্ষণী শক্তি

সম্ভবত হিমালয়ের পাদদেশ ও কোন কোন অনুন্নত অঞ্চল ছাড়া ভারতের সর্বত্রই ৩০ মাইলের ভেতর রেল লাইন আছে। উত্তর সীমান্তে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে অমৃতসর থেকে পূর্বে কলিকাতা, দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও পশ্চিমে বোম্বাই পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়া যায়। আধুনিক সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে রেলপথ সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

অনেক সময় ট্রেনে যেতে জংশন স্টেশনে অন্য গাড়ী ধরতে হয়। তুমি যে স্টেশনে যাবে সে লাইনে যাবে অন্য ট্রেন—এই জন্যেই ট্রেন বদলাতে হয়। অনেক সময় লাইনের প্রস্থ বা gauge এক নয় বলেও ট্রেন বদল করতে হয়।

আমাদের দেশে তিন রকম প্রস্থের লাইন আছে। সব চাইতে চওড়া ১.৬৮ মিটার। এ লাইনকে বলা হয় ব্রড গেজ। তারপর ঠিক ১ মিটার চওড়া মিটার গেজ। সব চাইতে ছোট ০.৬১ মিটার বা ০.৬৭ মিটার চওড়া ন্যারো গেজ। ভারতে অধিকাংশ লাইন ব্রড গেজ বা মিটার গেজ। আমাদের ৬০,৮০০ কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে ৩১,০০০ কিলোমিটার ব্রড গেজ, ২৫,৫০০ কিলোমিটার মিটার গেজ এবং মাত্র ৪,৫০০ কিলোমিটার ন্যারো গেজ। ব্রড গেজ লাইনের দৈর্ঘ মিটার গেজ লাইনের চেয়ে মাত্র





২৫ ভাগ বেশি হলেও মাল ও যাত্রীর শতকরা ৮৫ ভাগ যায় ব্রড গেজে। ন্যারো গেজ মাত্র দুই শতাংশ মাল যাত্রী বহন করে।

ন্যারো গেজের প্রধান সুবিধা, অনেক আঁকা-বাঁকা রাস্তায় এই লাইন



পাতা যায়। তাই পাহাড়ী অঞ্চলে এ লাইন পাততে অনেক কম সুড়ঙ্গ, সেতু, কাটিং বা বাঁধের প্রয়োজন। কিন্তু চওড়া গেজ হলে সে লাইনে বেশী মাল নেওয়া যায়। আর চওড়া গেজের ট্রেন অনেক বেশী আরামপ্রদ ও দ্রুতগামী।



ফ্যায়ারম্যান

আমাদের বেশীর ভাগ ইঞ্জিনই বাষ্পে চলে এবং তাতে কয়লা লাগে। আর বাকী ছ'রকমের ইঞ্জিন চলে ডিজেলে বা বিদ্যুৎশক্তিতে।

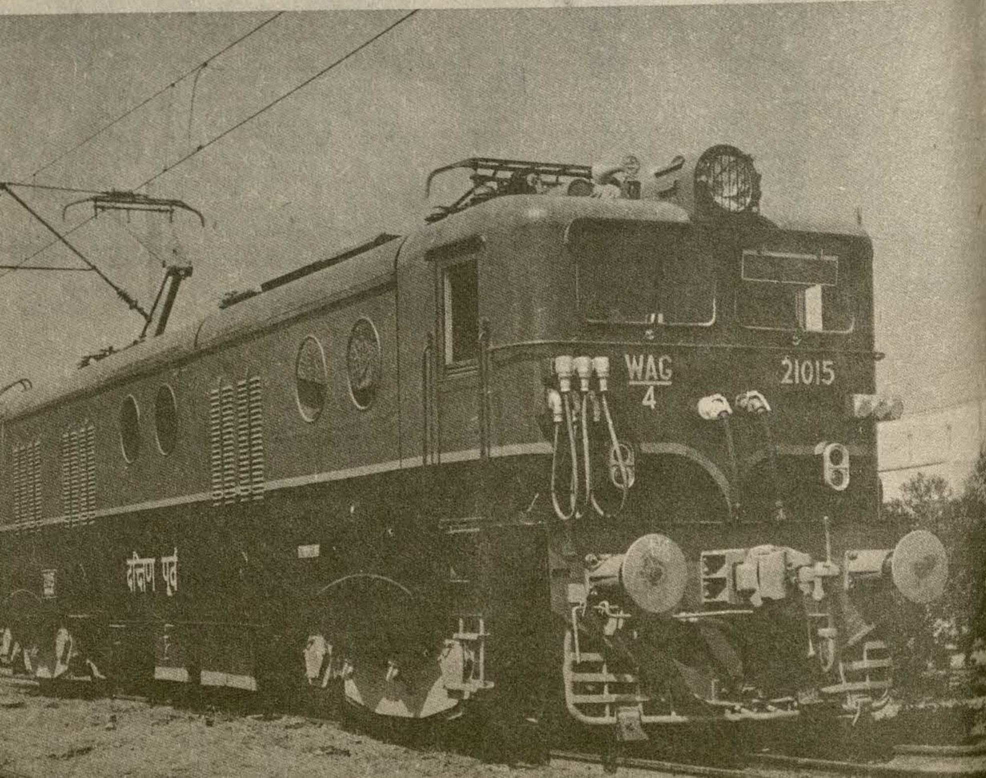
আগামী ১০ বছরে ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাবে। এই ছ'ধরনের ইঞ্জিনে ষ্টীম ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক কম খরচ

১ নং ছক

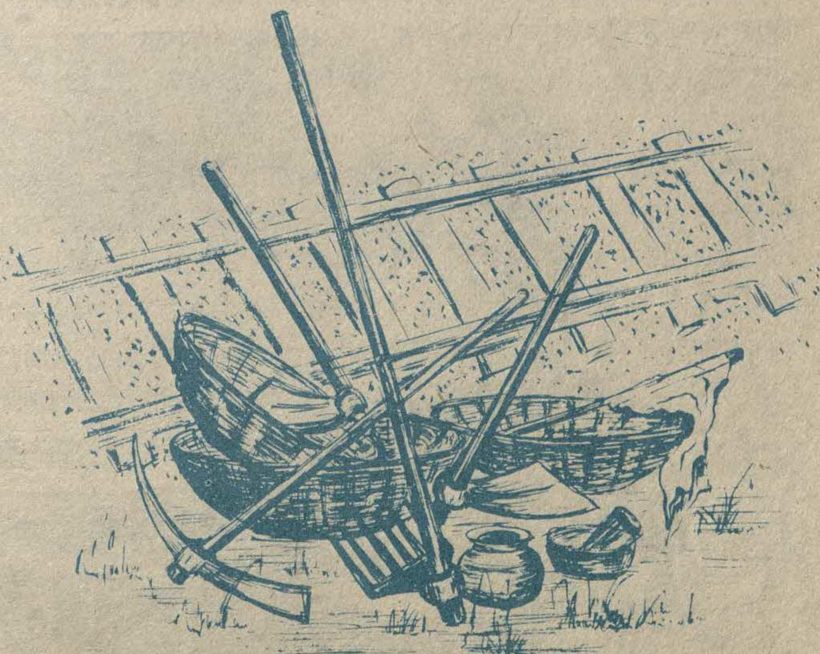
ভারতীয় রেল ইঞ্জিনের সংখ্যা

	ব্রড গেজ	মিটার গেজ	ন্যারো গেজ	মোট
ষ্টিম	৪৩০২	২৬৫৩	৩৪১	৭২৯৬
ডিজেল	১৯৫৮	৪৮৮	৬৯	২৫১৫
বৈদ্যুতিক	১০৮৪	২০	—	১১০৪
	৭৩৪৪	৩১৬১	৪১০	১০৯১৫

ভারতে তৈরী ইলেকট্রিক ইঞ্জিন



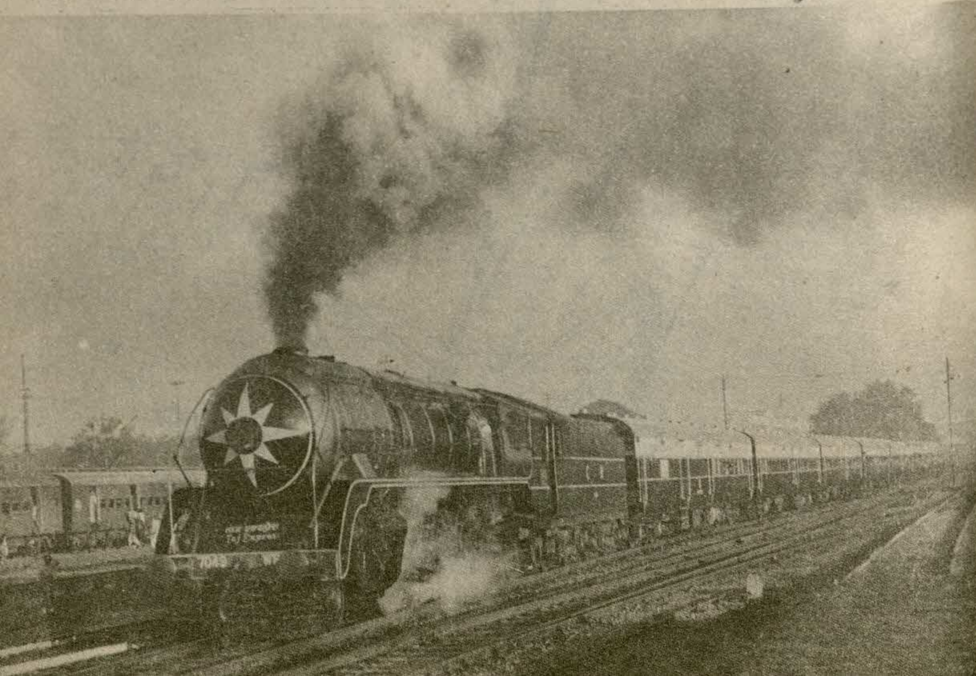
পড়ে। এক টানা অনেক দূর পর্যন্ত এগুলি চলতে পারে আর এদের গতিও দ্রুততর। রাস্তায় জল বা কয়লা নিতে এই ইঞ্জিনের সময় নষ্ট হয় না। ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণে ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে, শহরতলীর রেল পরিবহণে ও প্রধান প্রধান দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে এখন আমরা কেন ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ব্যবহার করছি।





ম্বাই-এর চার্চ্চগেট স্টেশনে অফিস যাত্রীদের

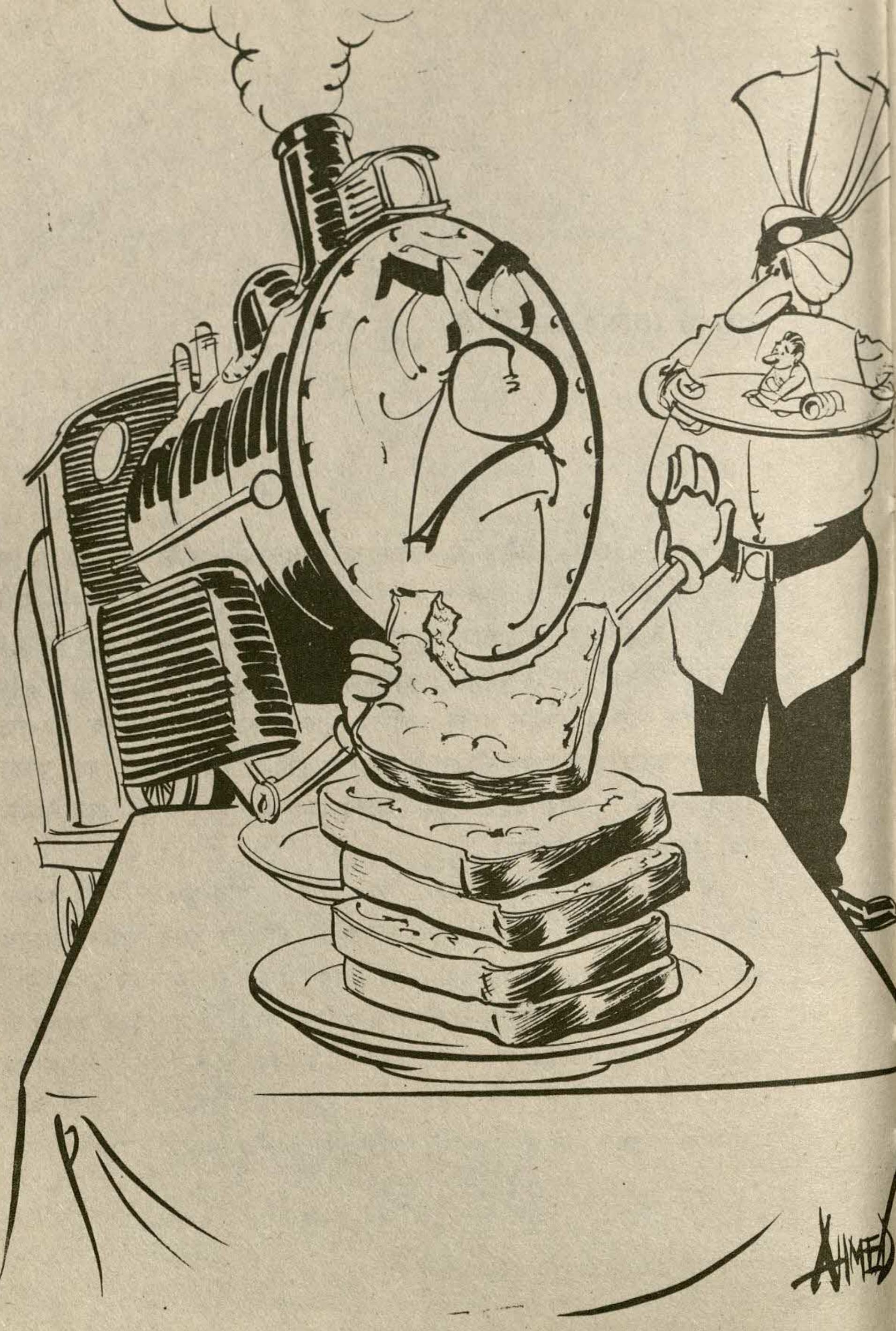
তাজ এক্সপ্রেস



রেল ও দেশের অর্থনীতি

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রী হিসেবে রেল সংস্থার একটা সামান্য অংশ আমাদের চোখে পড়ে। রেল পরিবহণকে ভাসমান হিমশৈলের (iceberg) সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভাসমান হিমশৈলের একটা ছোট অংশ জলের ওপরে দেখা যায়, বেশীর ভাগটাই থাকে জলের নীচে। তেমনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়ে রেলের বিশাল সংস্থার অতি সামান্য একটা অংশ আমরা দেখতে পাই। অথচ দেশের অর্থনীতির দিক থেকে রেলের সব চাইতে বড় কাজ, মালপত্র-বহন। আর এই থেকেই রেলের প্রধান আয়। শুধু এদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে এই নিয়ম।

রেল ভারতের জাতীয় সংস্থা। কিন্তু আমেরিকার মত পৃথিবীর অনেক দেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রেল চালায়। মালপত্র বহন বেশী লাভজনক বলে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যাত্রীদের দিকে বিশেষ নজর দেয় না। আইন বাঁচাতে এদের কিছুটা যাত্রী বহন করতে হয়, কিন্তু ট্রেনে যাত্রীদের আরামের ব্যবস্থা যথাসম্ভব কম ক'রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর লাভজনক মালপত্র বহনের দিকেই বেশী নজর দেয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা অন্যায় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ী রেল কোম্পানীর কাছে কোনটা ন্যায্য,


AHMED

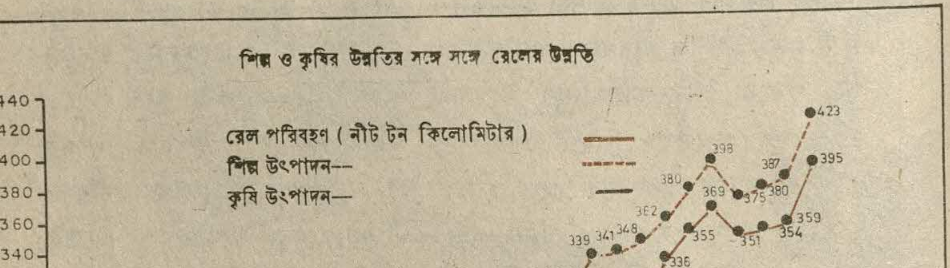
তা অত বড় কথা নয়, বড় কথা মুনাফা। ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ না হয়ে ক্রমাগত যদি লোকসান হতে থাকে তাহলে এরা ব্যবসাই তুলে দেবে। তাতে আইনগত কোন বাধা এলে এরা বলে, শুধু যাত্রী পরিবহণের জন্যে রেল আবিষ্কৃত হয়নি।

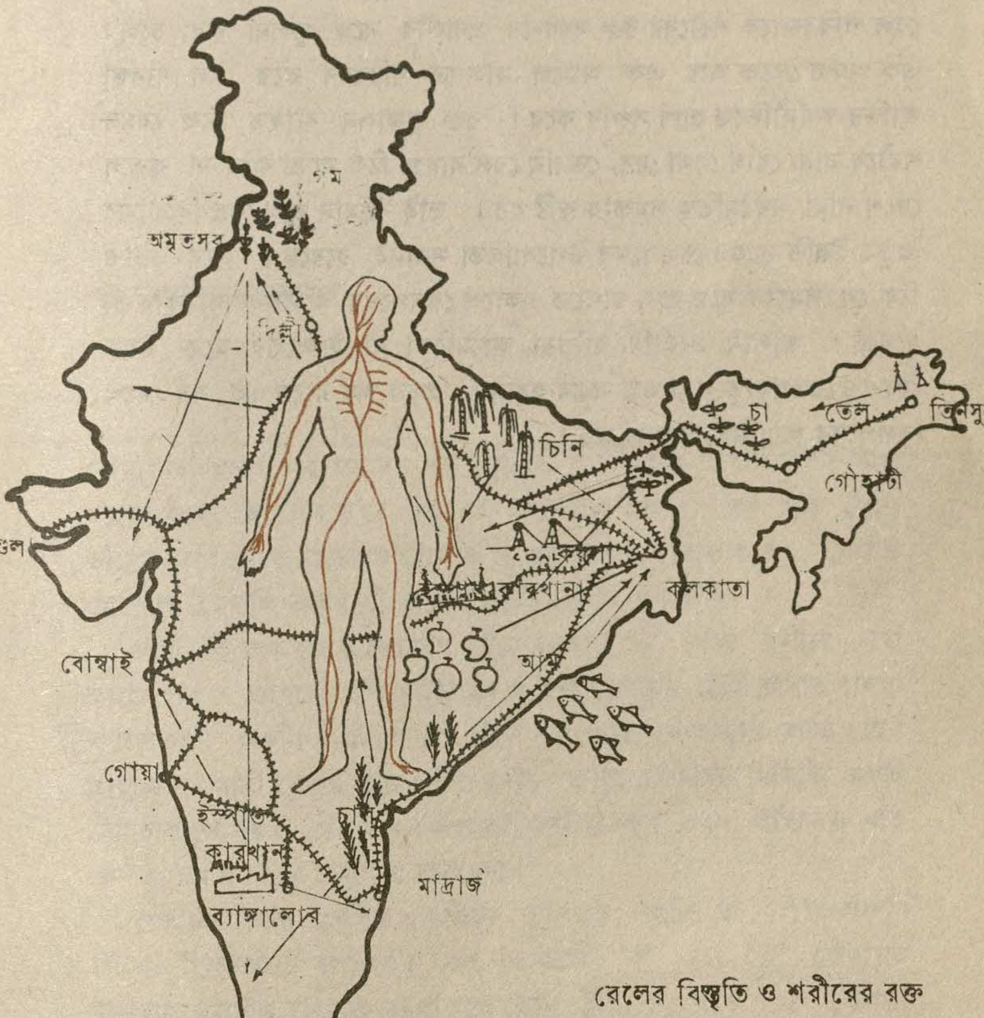
প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, রেলের মত সুলভ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ছাড়া শিল্প বিপ্লব কেন সম্ভব হতো না। তাই স্বাধীনতার পর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে রেল ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দেশের উন্নতিতে রেলওয়ে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে। যেমন, ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে রেলের দ্রুত প্রসার হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই সময় রাউরকেল্লা ও ভিলাই-এ দু'টি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। সেই সঙ্গে জামসেদপুর ও বার্ণপুরে পুরনো দু'টি কারখানার উৎপাদন শক্তিও দ্বিগুণ করা হয়। এতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলেরও বিরাট সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। ইস্পাত শিল্পের প্রসারের আগে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে দৈনিক ১,৫০০ ওয়াগনে মালপত্র বোঝাই হতো। এখন সেখানে দৈনিক ১২,০০০ ওয়াগনের প্রয়োজন। এতেই বোঝা যায়, ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কত দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হয়েছে।

সারা ভারতেই রেল পরিবহণের এই প্রসার দেশের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫০-৫১ সালে ৪৪০০ কোটি টন কিলোমিটার মালপত্র বহন করা হয়েছিল। মালপত্রের (টন) সমষ্টিকে যত কিলোমিটার পথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাই দিয়ে গুণ করলে টন কিলোমিটার পাওয়া যায়। ১৯৮১-৮২ সালে এই মালপত্রের পরিমাণ বেড়ে ১৭৪,০০ কোটি টন কিলোমিটারে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ৩১ বছরে রেলের মালপত্র পরিবহণ শতকরা ৩৯৫% ভাগ বেড়েছে। নীচের নকসাতে দেখতে পাবে

কৃষি ও শিল্পের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ভারতে রেলপথের উন্নতি হয়েছে। এতে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালের সঙ্গে ১৯৮১-৮২ সালের তুলনায় শিল্প উৎপাদন শতকরা ২৯৫ ভাগ, কৃষি উৎপাদন ১১১ ভাগ এবং রেলের পরিবহন শতকরা ৩২৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।





রেলের বিস্তৃতি ও শরীরের রক্ত
সঞ্চালন প্রণালী

শিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের প্রসার হতে বাধ্য। রেল পরিবহণকে শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে মালপত্র পরিবহণ করে রেল ব্যবস্থা জাতির অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করে। রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হলে যেমন শরীরে নানা রোগ দেখা দেয়, তেমনি রেল ব্যবস্থা ঠিক মতো কাজ না করলে দেশে নানা অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই বর্ত্তমান যুগে শিল্প বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও রেলপথের উপযোগিতা সমানই রয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে একালে রেলপথের অনেক আধুনিকীকরণ হয়েছে। জাপান, জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মতো উন্নত দেশেও রেলপথ তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই সব দেশে রেলপথের আধুনিকীকরণ হয়েছে।

শহরতলীর রেলপথ

বোম্বাই বা কলকাতার মত বড় বড় শহরের আশেপাশে যারা থাকো তারা হয়তো অনেকেই ট্রেনে ক'রে শহরের মাঝখানে যাও। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের বাড়ী থেকে প্রতিদিন ট্রেনে ক'রে কর্মস্থলে যাতায়াত করে। সেজন্যে লোকাল ট্রেনগুলি দ্রুতগামী ও বেশী লোক নেবার উপযোগী।

ধরো এক লক্ষ লোক লোকাল ট্রেনে সকাল ৫টা থেকে ১০টার মধ্যে কাজে যায়। তাহলে প্রতি ঘণ্টায় ২০ হাজার লোকের ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা করতে হয়। একটা যাত্রী-বোঝাই ট্রেনে বড় জোর এক হাজার লোক ধরে। তাহলে সব যাত্রী নেবার জন্যে ঘণ্টায় ২০টা অর্থাৎ প্রতি তিন মিনিটে একটি ট্রেন চালাতে হয়। ষ্টিম ইঞ্জিন এবং সাবেকী ব্যবস্থায় ডবল লাইনেও এত দ্রুত বা ঘন ঘন ট্রেন চালানো সম্ভব নয়।

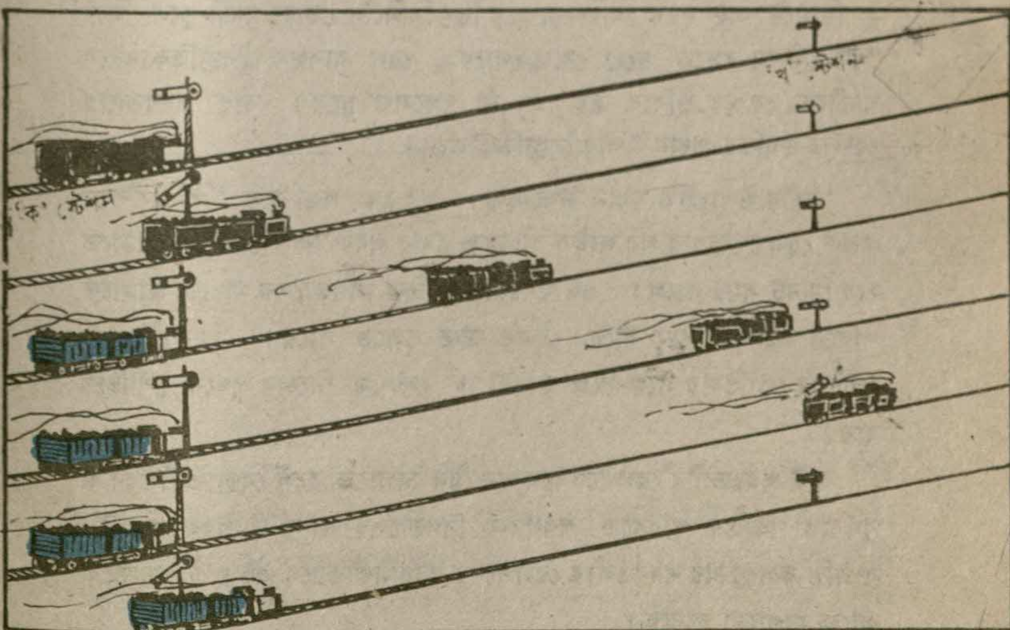
রেল চালানোর প্রচলিত প্রদ্ধতিকে পূর্ণ ব্লক পদ্ধতি বা "Absolute Block System" বলা হয়। এই পদ্ধতিতে "ক" এবং "খ" স্টেশনের মাঝখানের লাইন বাধামুক্ত না থাকলে কোন ট্রেন "ক" থেকে "খ" স্টেশনে যেতে দেওয়া হয় না। "খ" স্টেশনে একটি ট্রেন নিরাপদে পৌঁছনো মাত্র, সেই খবর "ক" স্টেশনে জানিয়ে দেওয়া হয় যাতে পরের ট্রেনটি "খ"



PLATFORM 1, 2 & 3
AHMED

স্টেশনের দিকে রওনা হতে পারে। "ক" এবং "খ" স্টেশনের মাঝপথে দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে এই সতর্কতা প্রয়োজন। নিরাপত্তার জন্যে দু'টি অনুগামী ট্রেনের মাঝে এতটা দূরত্ব রাখতেই হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, পীচের রাস্তায় ট্রাকের চাকার চাইতে রেল লাইনের ওপরে লোহার চাকা অনেক সহজে গড়িয়ে চলে। কিন্তু এতে অসুবিধাও আছে। দ্রুতগতি একটি ট্রেনকে থামাতে হলে অনেক দূর থেকে ব্রেক কষতে হয়।

পূর্ণ ব্লক পদ্ধতিতে "ক" এবং "খ" স্টেশনের মাঝে ঘন ঘন ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া ষ্টিম ইঞ্জিনে ট্রেনের গতি বাড়াতে বা কমাতে অনেক



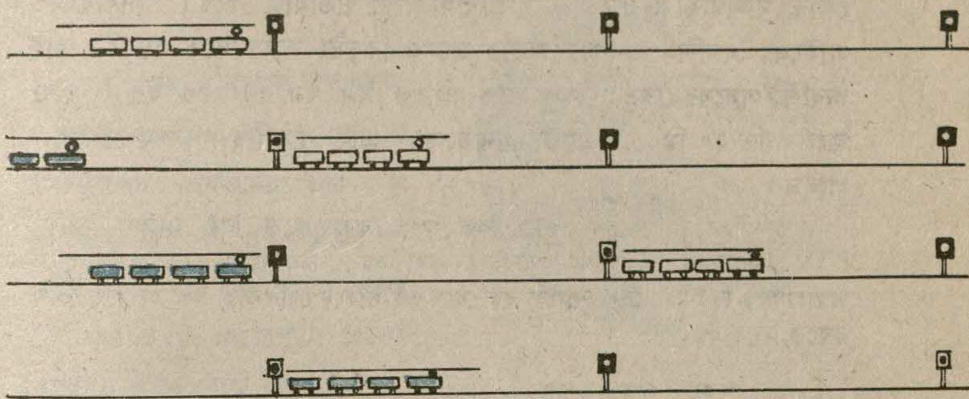
স্টার্টিং সিগন্যাল পূর্ণ ব্লক পদ্ধতি রিসেপশন সিগন্যাল

সময় লাগে। শহরতলীর রেলপথে ৩।৪ কিলোমিটার অন্তর অন্তর একটি ক'রে স্টেশন। ষ্টিম ইঞ্জিনে চালিত ট্রেন পূর্ণ গতিতে চলতে পারে না, কারণ পরের স্টেশনেই তাকে আবার থামতে হয়। তাই ষ্টিম ইঞ্জিনেও পূর্ণ ব্লক পদ্ধতিতে ১০।১২ মিনিটের কম ব্যবধানে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের প্রয়োজন মেটানো যায় না।

এই সমস্যার একটা সমাধান হল শহরতলী রেলের বৈদ্যুতিকীকরণ। ইলেক্ট্রিক ট্রেন প্ল্যাটফরম ছাড়তে ছাড়তেই ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। তেমনি অল্প দূরত্বের ভেতর কম সময়ে থামতেও পারে। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে চলতে চলতে ইলেকট্রিক ট্রেনকে একই প্লাটফর্মের দূরত্বের মধ্যে থামানো সম্ভব হয়। "ক" এবং "খ" স্টেশনের দূরত্ব যদি তিন কিলোমিটার হয়, তাহলে একটি ইলেক্ট্রিক ট্রেন ২ মিনিটে এই দূরত্ব অতিক্রম করে তিন মিনিটের ভেতর যাত্রী তুলে নিয়ে "খ" স্টেশন ছেড়ে চলে যেতে পারে। রেল ব্যবস্থার বৈদ্যুতিকীকরণে যাত্রীদের যে খুব সুবিধে হয়, তা না বললেও চলে। তাই শহরতলীর রেলের উন্নতির প্রধান উপায় বৈদ্যুতিকীকরণ।

দ্বিতীয় উপায়টিও সমান উপযোগী। পূর্ণ ব্লক পদ্ধতিতে "খ" স্টেশনে একটি ট্রেন পৌঁছবার পর লাইন বাধামুক্ত হবার খবর "ক" স্টেশনে পাঠাতে ২।৩ মিনিট সময় লাগে। এই খবরটা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালের মাধ্যমে জানাতে পারলে অনেকটা সময় বাঁচে, ট্রেনও দ্রুত চলতে পারে। যেমন ট্রেন 'খ' স্টেশনে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা 'ক' স্টেশনে নিজের থেকে পৌঁছিয়ে যায়।

তাই শহরতলীর রেলপথে ঘন ঘন ট্রেন চালাতে হলে বৈদ্যুতিকীকরণ ও পূর্ণ ব্লক পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালের প্রবর্তন খুবই জরুরী। সম্প্রতি কলকাতার শহরতলীর রেলপথের আধুনিকীকরণে এই দু'টি পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছে।



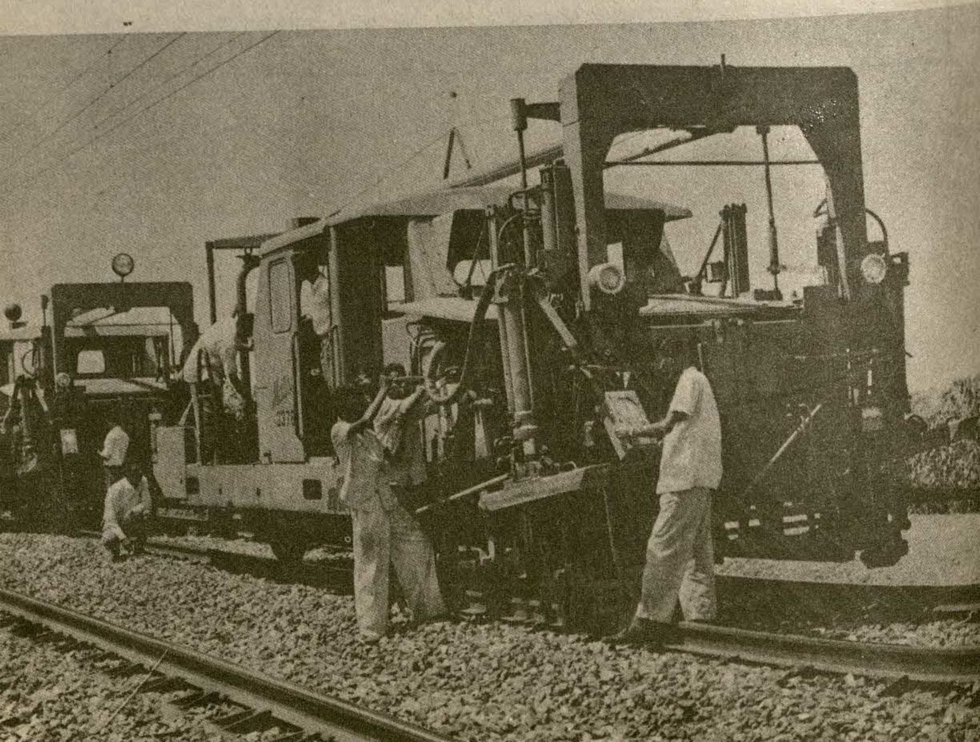
অটোম্যাটিক ব্লক পদ্ধতি

শহরতলীর রেলপথ ছাড়াও এমন অনেক ট্রাঙ্ক লাইন আছে যেখানে ঘন ঘন ট্রেন চালাবার প্রয়োজন। যেমন, পূর্ব রেলের গোমো থেকে গয়া হয়ে মোগলসরাই পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড কর্ড সেকসন। বাংলা ও বিহারের কয়লাখনি ও ইস্পাত কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতে পাঠাবার প্রধান

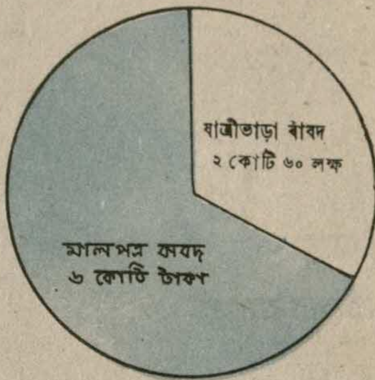
প্রাণকেন্দ্র এই লাইন। এই সেকসনের আপ ও ডাউন লাইনে প্রতিদিন ৪০ জোড়া মালগাড়ী ও ৭ জোড়া যাত্রীবাহী গাড়ী যাতায়াত করে। আবার এই লাইনের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও কিছুটা সময় দিতে হয়।* তাই অবশিষ্ট সময়ের ভেতর ট্রেনগুলিকে আরও ঘন ঘন চালাতে হয়। গ্রাণ্ড কর্ডে প্রতি ২০ মিনিটে একটা ট্রেন চলে। এটা পৃথিবীর অন্যতম ট্রেনবহুল লাইন।

* দৈনন্দিন মেরামতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যে টাই ট্যাম্পিং মেশিন (Tie Tamping Machine) ব্যবহার করা হয়। ঠিক মতো কাজ পেতে হ'লে অন্ততঃপক্ষে চার ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখে এই লাইনে মেশিনকে এক নাগাড়ে কাজ করতে দিতে হয়।

টাই ট্যাম্পিং মেসিন



এই রকম ট্রেনবহুল সেকসন-গুলিতে বৈদ্যুতিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালের প্রবর্তনের জন্য রেল ব্যবস্থার প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। প্রতি বছর এই সব কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনে রেলের মূলধনও ক্রমশ বেড়ে গেছে।



ভারতীয় রেলের দৈনিক আয়

রেল এখন দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় সংস্থা। রেলের মূলধন প্রায় ৮১৬৪ কোটি টাকা আর রেলে কাজ করে ১৫ লক্ষ লোক (১৯৮১-৮২-এর হিসাব)।

ভারতীয় রেলে ১০,৯১৫ ইঞ্জিন, ৩৮,১৬০ যাত্রীগাড়ী ও ৪ লক্ষ ওয়াগন আছে। এই রেলপথের ৭,৩০০ স্টেশনের যাত্রীদের জন্যে রোজ প্রায় দশ হাজার ট্রেন চলে।

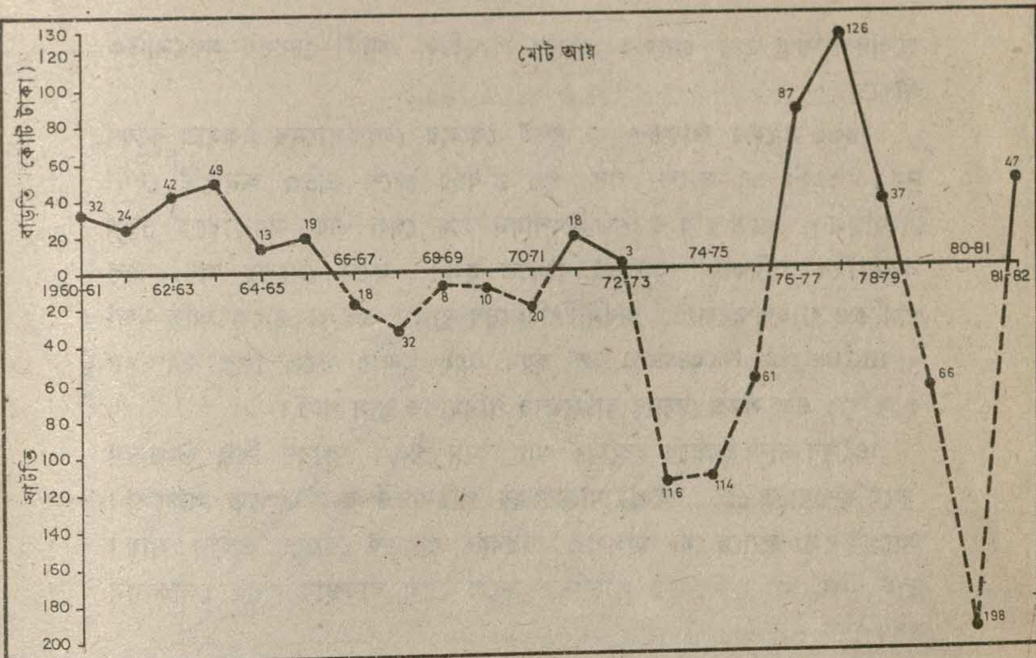
আমাদের রেলে রোজ এক কোটিরও বেশী বা ভারতের জনসংখ্যার এক শতাংশের বেশী যাত্রী যাতায়াত করে। প্রতিদিন ৭ লক্ষ টনেরও বেশী নানা উৎপন্ন দ্রব্য ৩৪,০০০ ওয়াগনে বোঝাই হয়ে চালান যায়। দৈনিক পরিবহণ থেকে রেলের আয় হয় ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আসে যাত্রী ভাড়া থেকে আর বাকী ৬ কেটি টাকা আসে মালের মাশুল থেকে।

রেলের বাজেট

আমাদের দেশের রেল ব্যবস্থা সরকার পরিচালনাধীন। এটা আমাদের সর্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এত বড় সংস্থাকে স্বভাবতই আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার। সৈন্যবাহিনী, পুলিশ বা বিচার বিভাগের মত শুধু কর দাতাদের টাকার ওপর রেলের নির্ভর করা চলে না। এই বিশেষ দায়িত্বের জন্যে রেলের বাজেট সাধারণ বাজেট থেকে আলাদা।

প্রত্যেক বছর লোকসভায় অর্থমন্ত্রী সাধারণ বাজেট পেশ করার আগে রেলমন্ত্রী রেলের বাজেট পেশ করেন। রেলের বাজেটে আগের বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব আর আগামী বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণ থাকে। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষায় রেল কতদূর সফল হয়েছে, তাই দেখানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে এই সমতা বজায় রাখতে পেরেছিল। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর সমস্ত খরচ মেটানোর পরও কিছু লাভ হয়েছে। কিন্তু এর পর থেকেই রেল বাজেটে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ঘাটতির পরিমাণ



খুব বেশী না হ'লেও এটা রেল কর্মীদের কাছে একটা বিরাট বিপর্যয়। স্বাধীনতার পর প্রায় ২০ বছর ধরে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতীয় রেলেই ক্রমাগত লাভ হচ্ছিলো। ১৯৬৫ সালের পর এই আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণ কি ?

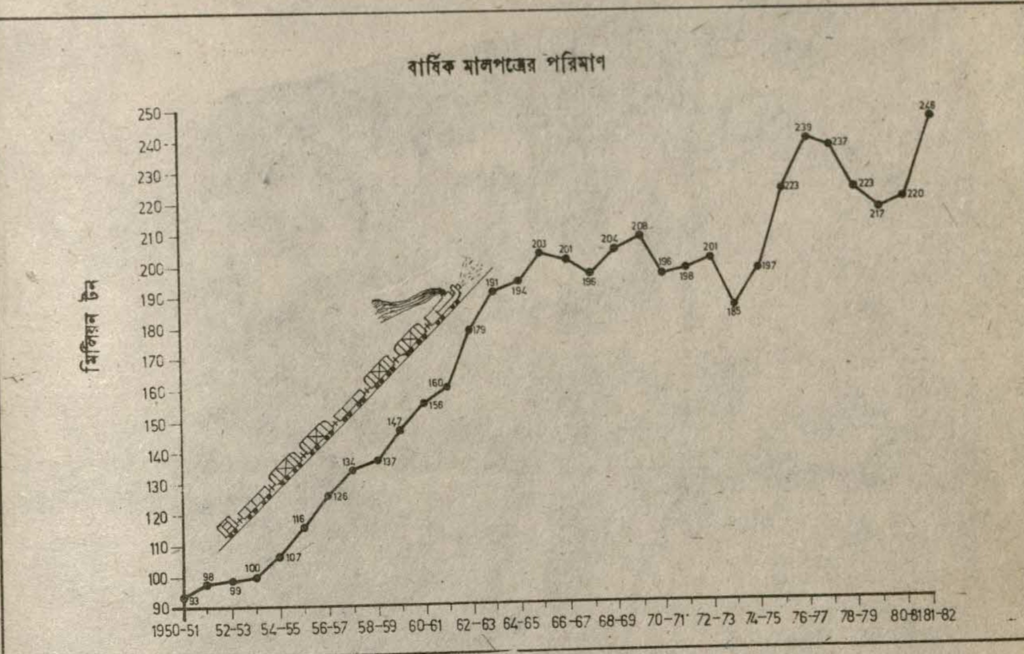
ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৫ সাল স্মরণীয় বছর। সেই বছরেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হয়। এ লড়াই মাত্র তিন সপ্তাহ স্থায়ী

হয়েছিল কিন্তু তার গুরুতর প্রভাব পড়েছিল গোটা দেশের অর্থনৈতিক জীবনে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধই রেলের লোকসানের একমাত্র কারণ নয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে পর পর দু'বছর দেশে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। এতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমে গেল এবং সরকারকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মুলতুবী রাখতে হল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিও ব্যাহত হলো। অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এই অবস্থাকে অতি মন্দা বা industrial recession বলা হয়। এই মন্দার ফলে শিল্প উৎপাদন কমে যায় এবং সমগ্র দেশের বাণিজ্যের পরিমাণও হ্রাস পায়।

এইসব নানা কারণে রেলের আয় কমে গেল। কারণ শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়াতে রেলে বইবার মালপত্রের পরিমাণও হ্রাস পেতে লাগলো। আগেই বলা হয়েছে যে, মালপত্র পরিবহণ থেকেই রেলের প্রধান আয়। তাই শিল্প ও বাণিজ্যের ঘাটতির ফলে রেল ব্যবস্থার খুবই লোকসান হয়।

আমাদের দেশে যোজনা শুরু হবার পর থেকে এই ত্রিশ বছরের সময়টাকে প্রায় সমান দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তিনটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পনের বছরে (১৯৫০-১৯৬৫) মাল পরিবহনের ক্ষমতা বেশ বেড়ে যাচ্ছিল। দেখা গেল, ১৯৬৫-৬৬ সালে রেল ২০ কোটি ৩০ লক্ষ টন মাল বহন করেছে। ১৯৫০-৫১ সালে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে মন্দাভাব এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বন্ধ করার জন্য রেল ২০১ লক্ষ টন মাল কম বহন করল। তার পরের বছরগুলিতে ১৯৬৬-৬৭ সালের পরিমাণের 'কাছাকাছি' মাল বহন করতে থাকে! রেলের বর্ষপঞ্জীতে (১৯৭৭-৭৮) এই কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনা বছরেই রেল সবচেয়ে বেশি মাল বহন করেছে। ১৯৭৫-৭৬ এবং ১৯৭৭-৭৮ এই তিন বছরে মোটামুটিভাবে মাল বহনের পরিমাণ বাড়লেও সেটা বেশিদিন চলে নি।



আবার তার অবনতি হতে থাকে। এটা চলতে থাকে ১৯৮০-৮১ সাল অবধি। দেখা গেল, ১৯৮১-৮২ সালে ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন মালবহন করে রেলওয়ে সর্বকালের রেকর্ড ভাঙল। আশা করা যায়, এই ক্রমোন্নতির হার বজায় থাকবে এবং পর্যাপ্ত রেল পরিবহনের অভাবে ভারতের শিল্পের প্রসারে কোন বাধা আসবে না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলের বৃটেনে যেমন রেলের ভূমিকা ছিল, ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি 'একমাত্র' প্রাণ-সঞ্চালন রক্ত প্রণালী হিসেবে ভারতীয় রেলের ভূমিকা রয়েছে। আমরা আশা করব, খুব শীঘ্রই এর বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান ঘটবে।



যুদ্ধে রেলের ভূমিকা

১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মালপত্র সরবরাহের দু'টি প্রধান পথ বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে উত্তর বাংলা, আসাম, নেফা, ত্রিপুরা ও নাগাভূমির অধিকাংশ এলাকায় প্রয়োজনীয় মালপত্র পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে রেল ও জলপথে পাঠানো হতো। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের এক বাণিজ্যিক চুক্তি অনুযায়ী এই দু'টো পথই ব্যবহার করা চলতো।

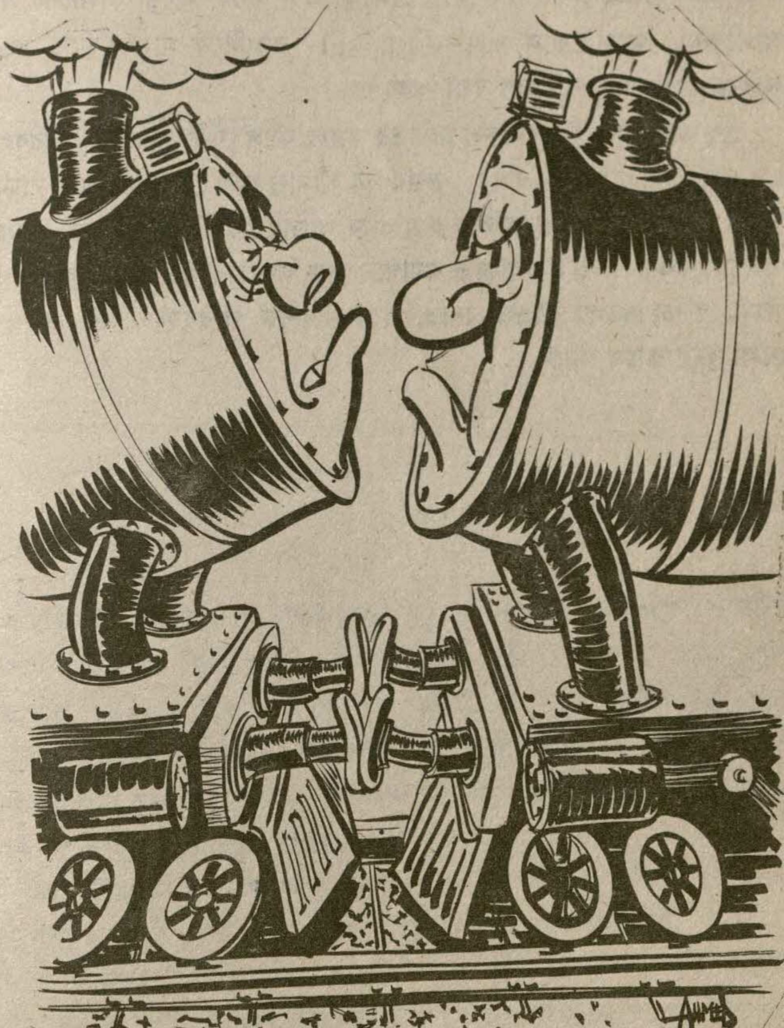
১৯৬৫ সালে এই দু'টো পথই বন্ধ হ'য়ে যায়। ফলে আমাদের চা ও পাটের আমদানী ব্যাহত হয়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এই দু'টি দ্রব্য ভারতের বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সীমান্তের ভেতর দিয়ে এই মালপত্র আনার জন্যে রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতা রাতারাতি বাড়াবার প্রয়োজন হ'লো। কিন্তু খুব সহজ কাজ এটা নয়, কারণ আগে থেকেই এই রেলপথের পরিবহণ শক্তির পুরোটাই কাজে লাগানো হচ্ছিলো।

এই অঞ্চলের রেলের উপর বাড়তি পরিবহণের বোঝা কি ক'রে চাপানো যায়? ভারতের রেল কর্মীরা আপৎকালে চিরকালই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। এরা এক অভিনব সমাধান বার করলো। এ অঞ্চলে ডিজেল ইঞ্জিনে মালগাড়ী টানা হয়। বেশী মালপত্র বইবার জন্যে বেশী ট্রেনের

দরকার। বেশী ট্রেনের জন্য বেশী ইঞ্জিনের। কিন্তু চট করে এত ইঞ্জিন যোগাড় করা তো সম্ভব নয়। তাই এক নতুন পদ্ধতি বার ক'রে ইঞ্জিনগুলিকে দিয়ে অনেক বেশী কাজ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হলো। তার ফলে ৬ মাসের ভেতর ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ প্রতি ইঞ্জিনের দৈনিক গড়পড়তা দৌড় ৯০ কিলোমিটার থেকে ২৯৪ কিলোমিটারে বেড়ে গেল।

কিভাবে তা সম্ভব হ'ল বুঝিয়ে বলছি। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই সিঙ্গল লাইনে রেল চলে। সিঙ্গল লাইন সেকসনে বিপরীতগামী দু'টো ট্রেনকে মাঝপথের কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পার হতে হয়। বদ্রীনাথের মত পাহাড়ের রাস্তায় যারা গেছে তারা এটা সহজেই বুঝতে পারবে। পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় রাস্তা সরু। তাই বিপরীতমুখী দু'টো গাড়ী পাশাপাশি পার হতে পারে না। এইসব রাস্তায় নীচের গাড়ীগুলো না আসা পর্যন্ত উপরমুখী গাড়ীগুলিকে একটা 'গেটে' আটকে রাখা হয়। ঠিক তেমনি বিপরীতমুখী দু'টো ট্রেনকে সিঙ্গল লাইনে পার করাবার জন্যে মাঝপথের স্টেশনে দাঁড় করানো হয়, তা না হলে সামনাসামনি ধাক্কা লাগা এড়ানো গেলেও দু'টো ট্রেন এক লাইনে গিয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যাবে।

এই কারণে সিঙ্গল লাইন সেকসনে খুব ভেবেচিন্তে ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হয়। ট্রেনের সংখ্যা যত বাড়বে ক্রসিং-এর তত দেরী হবে। ক্রমশ এমন অবস্থা হবে যে, একটা ট্রেন বাড়ালে অন্য ট্রেনগুলির চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম হবে। এটা হবার কারণ এই যে, একটি ট্রেনকে পার করাতে এত বেশী ট্রেনের অপেক্ষা করতে হয়, খুব কম ট্রেনই চলতে-ফিরতে পারে। প্রকৃতপক্ষে লাইনটায় এত ভিড় হয়ে যায় যে, আগের চেয়ে অনেক কম মালপত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রেলপথে ভারত-পাক যুদ্ধের আগে থেকেই যতদূর সম্ভব বেশী ট্রেন চালানো হচ্ছিলো। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ট্রেন বাড়ালে যাতায়াতের সুবিধে হতো না, শুধু ভাড়াই বেড়ে যেতো। সুতরাং ট্রেনের সংখ্যা না বাড়িয়ে বেশী মালপত্র কি ক'রে নিয়ে



যাওয়া যায়, সে সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ালো। তাই ট্রেনের সংখ্যা বাড়াবার বদলে দু'টো প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে এক সঙ্গে জুড়ে চালানো হতে লাগলো। ফলে কোন ভীড় হ'লো না। অন্যদিকে মালগাড়িতে একই লাইনে বেশী মাল পরিবহণ করা সম্ভব হল।

শুধু তাই নয়, ট্রেন চলাচল দ্রুততর করার ফলে বেশী মালপত্র পরিবহণে কম ওয়াগনের প্রয়োজন হল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-রেল থেকে ২,০০০ বাড়তি মিটার গেজ ওয়াগন,—যার দাম হবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা, অন্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাড়তি ওয়াগনে অন্য অঞ্চলের উন্নতির সুবিধে হল। যেমন, পশ্চিমাঞ্চলের কাণ্ডলা বন্দর থেকে খাদ্যশস্য পরিবহণে এই ওয়াগন-গুলো খুবই কাজে আসে।

রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

রেল ইতিহাসের শুরুতে ইংলণ্ডের লিভারপুল ম্যান্‌চেষ্টার রেলপথের উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রথম ট্রেনটিতে চাপা পড়ে প্রাণ হারান। ১৮৩০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের এই দুর্ঘটনায় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার উইলিয়ম হাচিনসনের মৃত্যুর পর থেকে সারা পৃথিবীতে রেল পরিচালনার প্রধান চিন্তাই হল নিরাপত্তা। গত ১৪০ বছরের রেলের ইতিহাসে নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে।

এর আগে পূর্ণ ব্লক পদ্ধতিতে রেল চালনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা উদাহরণ। এই নিয়ম অনুযায়ী দু'টো স্টেশনের মাঝপথের একটা লাইনে এক সময়ে শুধু একটা ট্রেনই আসতে পারে। কোন ট্রেনকে 'ক' স্টেশনে যেতে হলে, 'খ' স্টেশন থেকে যে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয় তাকে বলে "লাইন ক্লিয়ার"। তেমনি 'খ' স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে


PE-E-E
AHMED

যেতে হলে আবার পরবর্তী স্টেশন থেকে ''লাইন ক্লিয়ার'' নিতে হয়। "লাইন ক্লিয়ার" মানে হু'টো স্টেশনের মাঝের লাইন বাধামুক্ত আর আগের স্টেশনে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া গেছে। যে স্টেশন অভিমুখে ট্রেনটা যাবে সেই স্টেশন মাস্টারের ওপর "লাইন ক্লিয়ার" দেবার দায়িত্ব।

একটা স্টেশনে কোন ট্রেনকে আসবার অনুমতি দেওয়ার সময় অনুরূপ কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা হয়। ধর ''খ'' স্টেশনে হু'টো লাইন। ''ক'' স্টেশনকে ''লাইন ক্লিয়ার'' দেবার পর ট্রেনটাকে ''খ'' স্টেশনে ঢুকতে দেবার আগে ''খ'' স্টেশনে ঢোকার ও বেরোবার মুখে কয়েকটা সিগন্যাল আছে। ট্রেন ড্রাইভারকে এর প্রত্যেকটি সিগন্যাল মেনে চলতে হয়। সিগন্যালগুলিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেনের ড্রাইভারকে ঠিক কি ভাবে ট্রেন চালাতে হবে স্টেশন মাস্টার তা জানিয়ে দেয়। যে ট্রেন গতি না কমিয়ে সোজা মেন লাইন দিয়ে বেরিয়ে যাবে তার জন্যে ঢোকার ও বেরোবার সব কটা সিগন্যাল নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যে ট্রেন স্টেশনে দাঁড়াবে তার জন্যে শুধু ঢুকবার সিগন্যালগুলি নামানো হয়; বেরোবার সিগন্যালগুলি তুলে রাখা হয়।

নিরাপত্তার জন্যে যে কোন একটা সিগন্যাল নামানোর আগে দেখা হয় যে, লাইন শুধু সেই সিগন্যাল অবধি নয়, তার পেছনেও কিছুদূর অবধি বাধামুক্ত আছে কিনা। ধরা যাক, কোন স্টেশনে ৪টি ঢুকবার ও বেরোবার সিগন্যাল। তাদের নম্বর যথাক্রমে স$_{১}$ স$_{২}$ স$_{৩}$ স$_{৪}$। স$_{১}$ সিগন্যাল নামাতে হলে শুধু স$_{১}$ ও স$_{২}$ এর ভেতর লাইন বাধামুক্ত থাকলে চলবে না, স$_{৩}$ অবধি লাইন খালি থাকতে হবে। স$_{২}$ ও স$_{৩}$ এর মাঝের দূরত্বকে 'পর্যাপ্ত দূরত্ব' বা "adequate distance beyond" বলা হয়।



কোন লাইনে একটা ট্রেন ও অন্য কোন বাধার মাঝখানে অন্ততঃ দুটো সিগন্যালের ব্যবধান রাখাই এই দূরত্বের উদ্দেশ্য। যদি স$_{২}$ ও স$_{৩}$ এর মাঝখানের লাইনে কোন বাধা থাকে তা হলে স$_{১}$ ও স$_{২}$—এই দুটো সিগন্যালই বিপদ সূচনা করবে। ধরো শুধু স$_{২}$ অবধি লাইন বাধামুক্ত রেখে স$_{২}$ সিগ-

ন্যালের পরে কিছু বাধা থাকলেও, স$_{১}$ সিগন্যাল নামানো হল। তাহলে ড্রাইভারকে স$_{২}$ অবধি এসে দাঁড়াতে হবে। যদি ড্রাইভার স$_{২}$ তে এসে ঠিকমতো দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কোন বিপদ নেই। কিন্তু যদি কোন কারণে স$_{১}$ তে ড্রাইভার ট্রেন দাঁড় করাতে না পেরে স$_{২}$ সিগন্যাল পেরিয়ে যায়, তাহলে লাইনের ওপরের বাধার সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কা লাগবে। তাই স$_{২}$ এর পিছনেও "পর্যাপ্ত দূরত্ব" অবধি লাইন খালি না থাকলে স$_{১}$ সিগন্যাল নামানোর নিয়ম নেই। 'মানবিক ত্রুটি' বা "human failure" জনিত দুর্ঘটনা নিবারণের এটা একটা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 43

কোন কোন বিদেশী বিশেষজ্ঞ ভারতীয় রেলের এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন ড্রাইভারের যখন স$_{২}$ সিগন্যাল বিপদ সংকেত করলে দাঁড়াবার কথা, সেখানে স$_{১}$কেও নামানো হয় না কেন? এর উত্তর, সব কর্মীর সব সময় সব নিরাপত্তার নিয়ম মেনে চলার ক্ষমতা আছে—এ ব্যাপারে আমরা এখনও আস্থাবান নই। কারিগরী দিক থেকে উন্নত দেশের লোকেরা যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতায় অনেক বেশী অভ্যস্ত। অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে যান্ত্রিক শৃঙ্খলা মেনে চলা এদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। নিজের নিজের কাজ ঠিকমতো করার ব্যাপারে প্রত্যেকের ওপরে যখন নির্ভর করা চলে তখনই দেশের শিল্প ক্ষেত্রে প্রগতি করা সম্ভবপর। কিন্তু এদেশে একজন লোক ঠিকমতো কাজ করছে কিনা দেখবার জন্যে এখনও আমরা দ্বিতীয় জনকে নিয়োগ করি!

ভারতে যদি এই রকম বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করতে হতো তাহলে রেল চলাচল অনেক বেশী সুলভ ও নিরাপদ হতে পারতো।

২ নং ছকে দেখতে পাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে রেল কতটা সুলভ ও নিরাপদ। প্রথম সারিতে দেখানো হয়েছে প্রতি ১০ লক্ষ ট্রেন কিলোমিটারে দুর্ঘটনার সংখ্যা, দ্বিতীয় সারিতে কিলোমিটার প্রতি যাত্রী ভাড়ার হার। তৃতীয় সারিতে ১ টন কিলোমিটার মালের গড়পড়তা মাশুল। এতে দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ রেল ব্যবস্থার তুলনায় ভারতীয় রেলের

যাত্রী ও মালের মাশুল ৩ থেকে ৪ গুণ কম কিন্তু দুর্ঘটনার হার প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী।

২ নং ছক

	দুর্ঘটনার হার	যাত্রী ভাড়া	মালের মাশুল
	প্রতি মিলিয়ন ট্রেন কিলো-মিটার-এ দুর্ঘটনার সংখ্যা	প্রতি যাত্রী কিলোমিটারে গড়পড়তা ভাড়া (পয়সা)	প্রতি টন কিলোমিটারে গড়পড়তা মাশুল (পয়সা)
১) ভারতীয় রেলওয়ে	৩.১১	৪.৪৮ (১৯৮১-৮২)	৩১.৭০
২) জাপানী ন্যাশনাল রেলওয়ে	১.৫০	৪৪.১৮ (১৯৮১)	৩৩.১৩
৩) কানাডা প্যাসিফিক রেলওয়ে	৫.৭৭	৪৩.৫৭ (১৯৮১)	১৩.৬১
৪) জার্ম্মান ফেডারেল রেলওয়ে	১.৯৫	৭৬.৫৬ (১৯৮১)	৫৫.৬৫
৫) ব্রিটিশ রেলওয়ে	১.০৩	৫৫.৭৭ (১৯৮১)	৪৯.০১
৬) ফরাসী ন্যাশনাল রেলওয়ে	০.৭৩	৪৫.৭১ (১৯৮১)	৫৭.৯৪
৭) যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর রেলপথ	—	৫৬.২৭ (১৯৮০)	১৬.৭৪

রেলের সংগঠন

কোন নিকট আত্মীয় রেলে কাজ না করলে রেলের সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু তুমি নিশ্চয়ই স্টেশনে গেছো, টিকিট কিনতে, কোথাও ট্রেনে করে বেড়াতে, পার্শেল অফিস থেকে ফলের ঝুড়ি আনতে কিংবা অব্যবহৃত টিকিটের টাকা ফেরত নিতে। তোমার কাজের জন্যে সব সময় কোন না কোন রেল কর্মীকে পেয়েছো। আর না পেলেও অন্ততঃ অভিযোগ শোনার জন্যে এবং তার প্রতিকারের জন্যে কাউকে তো নিশ্চয় পেয়েছো। তোমাদের চোখের আড়ালে এক বিপুল সংখ্যক রেল কর্মী এইসব কাজ নিঃশব্দে ক'রে চলেছে।

রেল সংগঠন অনেকটা আমাদের শরীরের মত। যেমন মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অংশ নিজের নিজের কাজ ক'রে শরীরকে সুস্থ রাখে, তেমনি রেলের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের নিজের কাজ ক'রে রেলকে চালু রাখে। স্টেশনে তুমি যখন ট্রেনের সময় জিজ্ঞেস করো

তখন রেলের শুধু একটি অঙ্গের সংস্পর্শে আসো। কিন্তু রেলের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এক বিশাল সংগঠনের মাধ্যমে দিনরাত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ ক'রে চ'লেছে।

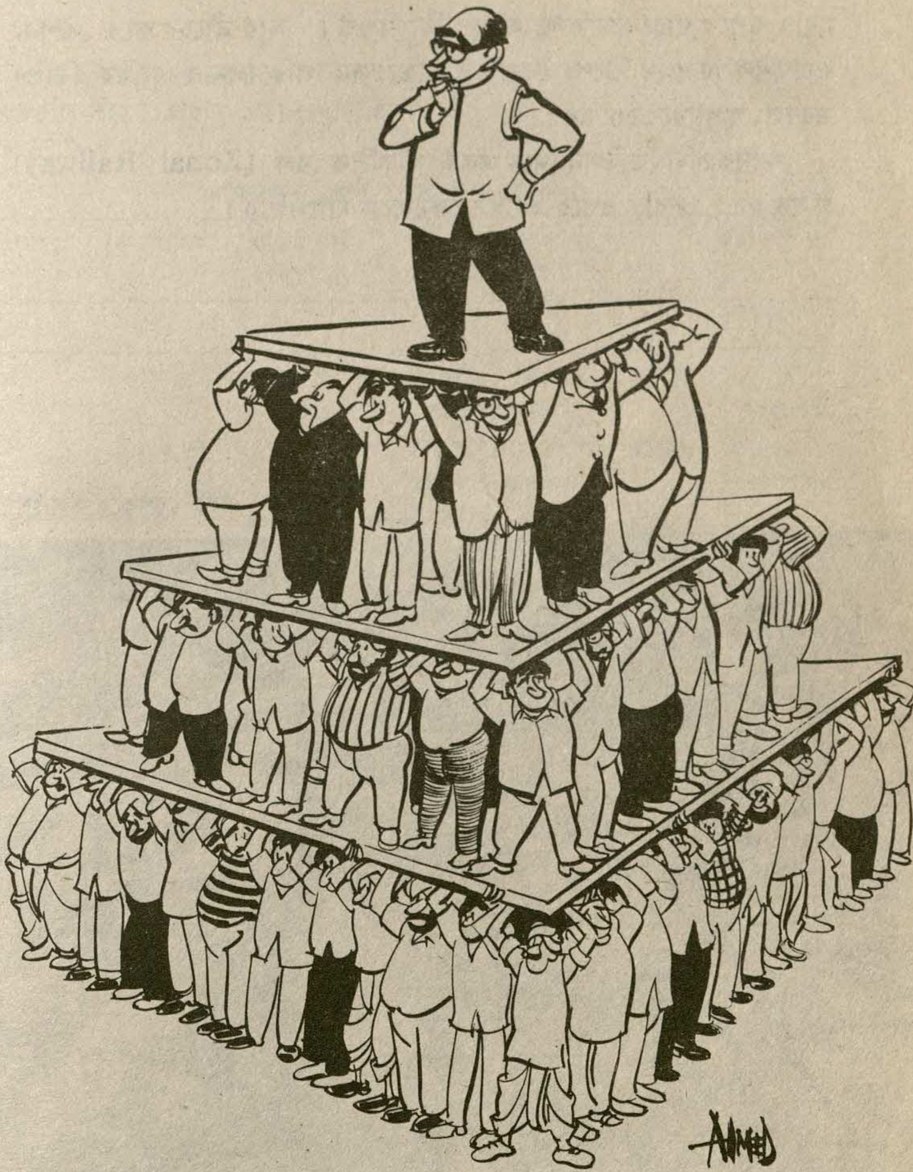
রেল সংগঠনের বিভিন্ন অঙ্গ একই ছাঁদে তৈরী। এই সংগঠনের প্রত্যেটি অঙ্গ এমনভাবে তৈরী যাকে দেখলে মনে হয় এর কাঠামোটা ঠিক যেন পিরামিডের মত—ওপরে একটা বিন্দু থেকে শুরু হয়ে নীচে ভিত্তি অবধি ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে। নীচে যদি ১,০০০ লোক কাজ করে, তাদের কাজের দেখাশোনা করবার জন্যে ১০০ জন থাকে। এই ১০০ জনের কাজ দেখাশোনা করে হয়তো ১০ জন। আর সেই ১০ জনের কাজের নির্দেশ দেয় একদম ওপরের ১ জন লোক। নীচের ১,০০০ লোক আর সবার ওপরের ১ জন লোকের মাঝে ছ'টি মধ্যবর্তী স্তরের ১০০ জন ও ১০ জন এই সংস্থাকে পিরামিডের আকৃতি দেয়।

রেলের মূল কর্মকেন্দ্র স্টেশন। স্টেশনের কর্মী সংস্থাও পিরামিডের মত। সব চাইতে ওপরে থাকে একজন স্টেশন মাস্টার, নীচে থাকে লাইন বদলাবার পয়েন্টস্‌ম্যান্, সিগন্যালের আলো জ্বালবার ল্যাম্পম্যান্, টিকিট বিক্রীর জন্য বুকিং ক্লার্ক ইত্যাদি।

জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা স্টেশনের প্রধান কাজ। অন্য সব কাজের জন্যে স্টেশন ছাড়াও রেলের অনেক সংগঠন আছে। যেমন, লোকোশেড, কোচ ও ওয়াগন ডিপো, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিগন্যাল কারখানা ইত্যাদি। এই সব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ হয়। যেমন সিগন্যাল কারখানায় সিগন্যাল মেরামত করা হয়।

স্টেশন, লোকোশেড ও ডিপো—এগুলো প্রধানতঃ স্থানীয় কাজেই ব্যবহৃত হয়।

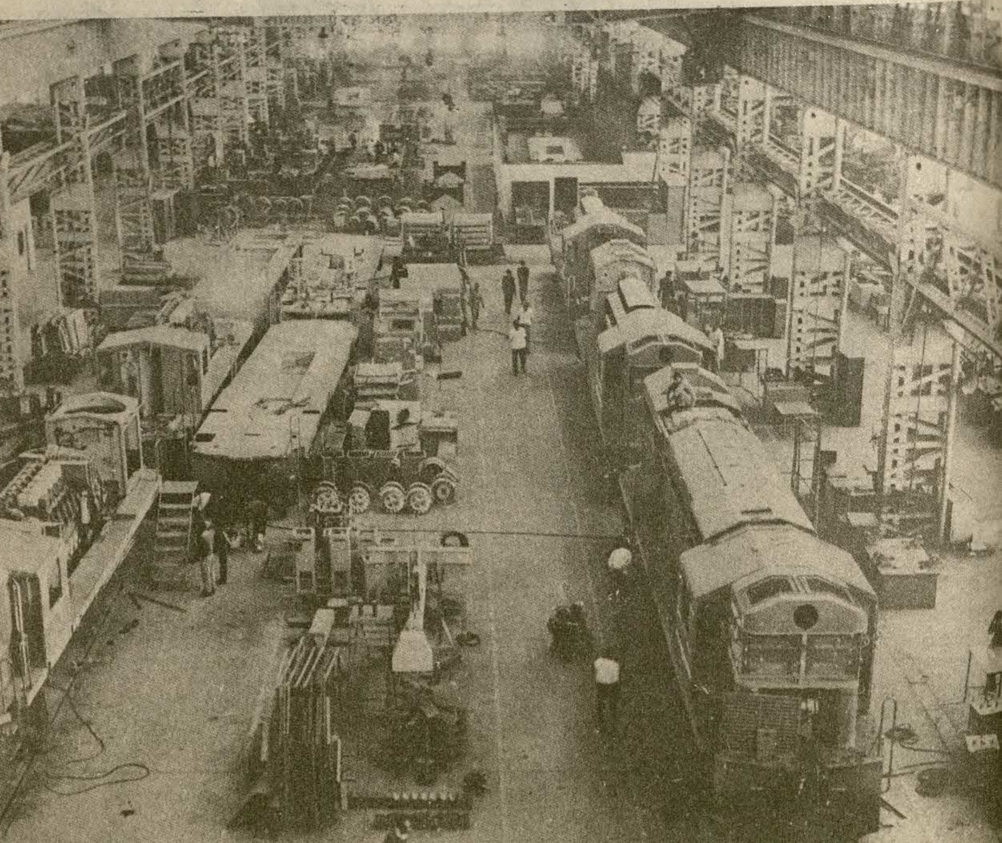
এক এক অঞ্চলের স্টেশন, লোকোশেড ও অন্যান্য স্থানীয় ডিপো নিয়ে যে পিরামিড গঠিত হয় তাকে বলে ডিভিসন। এই ডিভিসনের পিরামিডের


AHMED

সবার ওপরে থাকে ডিভিসন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আর নীচের স্তরে স্টেশন, ওয়ার্কশপ, ওয়াগন ডিপো ইত্যাদি। ডিভিসন পরিচালনার দায়িত্ব ডিভিসন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের।

অনেকগুলি ডিভিসন নিয়ে একটি আঞ্চলিক রেল (Zonal Railway) গঠিত হয়। সবার ওপরে থাকেন জেনারেল ম্যানেজার।

একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ



ভারতীয় রেলকে ৯টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। নীচে ৩নং ছকে আঞ্চলিক রেলগুলি সম্বন্ধে প্রধান তথ্য দেওয়া হ'ল।

৩ নং ছক

আঞ্চলিক রেল সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী

রেলওয়ে	হেড অফিস	রুটের দৈর্ঘ (কিঃ মিঃ)	ডিভিসনের সংখ্যা ও হেড অফিস	কর্মী সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মধ্য	বোম্বাই	৬৬৬৯	৫—ভুসাবল, বোম্বাই, ঝাঁসী, জব্বলপুর ও নাগপুর	২০০৮০২
পূর্ব	কলকাতা	৪১১৭	৫—আসানসোল, দানাপুর, হাওড়া, শিয়ালদহ ও ধানবাদ	২১৪৭৪৯
উত্তর	দিল্লী	১০৭৮৯	৭—এলাহাবাদ, বিকানীর, ফিরোজপুর, যোধপুর, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ ও দিল্লী	২১৮৫৯৩
উত্তর-পূর্ব	গোরখপুর	৫১০৪	৪—সমস্তীপুর, ইজ্জতনগর, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী	৯৮৬৩৮
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত	মালিগাঁও (পাণ্ডু)	৩৬২৮	৪—কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, লামডিঙ্ ও তিনসুকিয়া	৮৫৯২৮
দক্ষিণ	মাদ্রাজ	৬৪৮৯	৬—গুণ্টাকল্, মহীশূর, মাদ্রাজ, ওলভাকোট, তিরুচিরাপল্লী ও মাদুরা	১২৪৮৭১
দক্ষিণ-মধ্য	সেকান্দ্রাবাদ	৬৪৭৯	৪—বেজোয়াদা, সেকান্দ্রাবাদ, হুবলী ও শোলাপুর	১১৩৩৫২
দক্ষিণ-পূর্ব	কলকাতা	৬৯৯৯	৭—নাগপুর, বিলাসপুর, চক্রধরপুর, খড়গপুর, আদ্রা, খুড়দা-রোড ও ওয়ালটেয়ার	১৯৫৭৮৭
পশ্চিম	বোম্বাই	১০৩৩৭	৮—বোম্বাই, বরোদা, রাতলাম, কোটা, আজমীর, জয়পুর, রাজকোট, ও ভবনগর	১৯৩৭৬৫
মোট		৬০,৬৯৩		১,৪৪৬,৪৮৫

নয়টি আঞ্চলিক রেলওয়ে ছাড়া আরও দু'টি প্রধান বিভাগ আছে। একটি হ'ল, রিসার্চ ডিজাইন ও ষ্টাণ্ডার্ডস্ অরগানাইজেসন (R.S.D.O.) ; এখানে রেল বিষয়ক গবেষণা করা হয়। অন্য বিভাগটিতে রেলের ইঞ্জিন ও যাত্রীগাড়ী তৈরী হয়।

ট্রেন চালাতে অতি আবশ্যকীয় তিনটি জিনিষ হল ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ী। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু মালগাড়ী তৈরী করে ইঞ্জিন ও যাত্রীগাড়ী রেলের কারখানায় তৈরী হয়। ইঞ্জিন তৈরীর জন্যে চিত্তরঞ্জন ও বারাণসীতে দু'টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে স্টীম ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, বারাণসীর ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে ডিজেল ইঞ্জিন, আর মাদ্রাজে ইন্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরীতে যাত্রীগাড়ী তৈরী হয়। এই তিনটি উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান তথ্যগুলি নীচের ছক-এ দেওয়া হল।

৪ নং ছক

উৎপাদন সংস্থা	উৎপাদন চালু হবার সময়	১৯৮১-৮২-এর উৎপাদন		কর্মীসংখ্যা
চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্	নভেম্বর ১৯৫০	ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন (এ.সি) ডিজেল	৫০ ৩২	১৬১১৪
ইন্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরী, মাদ্রাজ	অক্টোবর ১৯৫৫	যাত্রীগাড়ী	৭৩০	১৪৫৪৯
ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্, বারাণসী	জানুয়ারী ১৯৬৪	ডিজেল ইঞ্জিন	১৩৭	৮০২২

এইসব সংস্থার গঠনও পিরামিডের মত। এর মূলে আছে কারখানার কর্মীরা আর সবার ওপরে একজন জেনারেল ম্যানেজার।

রিসার্চ ডিজাইন ও ষ্টাণ্ডার্ডস্ অরগ্যানাইজেসনে রেলের নানা বিষয়ে গবেষণা করা হয়। রেল সম্বন্ধীয় কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি সাধন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে কারিগরী উন্নতি হয়েছে তার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাবার জন্যে এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজ। তাই R.D.S.O-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

রেল সংগঠনের ৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৩টি উৎপাদন সংস্থা ও R.D.S.O-এর অধিকর্তারা একদিকে এক পিরামিড রচনা করেছেন, অন্যদিকে সর্বোচ্চ বিন্দুতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। রেল পরিচালনা বিষয়ে রেল মন্ত্রীকে সংসদে জবাবদিহি করতে হয়। রেল মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্যে একজন উপমন্ত্রী আছেন। রেল মন্ত্রী রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে কাজ করেন। রেল চালনায় সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও কারিগরী দায়িত্ব রেলওয়ে বোর্ডের।



রেলের রূপসজ্জা

আগেই বলা হয়েছে, রেলের প্রধান আয় মালপত্রের পরিবহণ থেকে, যাত্রী পরিবহণ থেকে নয়। তবে জনপ্রিয়তার স্বার্থে রেলের কিছুটা রূপসজ্জার প্রয়োজন। তাই অনেক ট্রেনে যাত্রীদের জন্যে রকমারী আরামের ব্যবস্থা। পঞ্চাশ বছর আগে রেলের গৌরবোজ্জ্বল দিনে ভ্রমণ-বিলাসিতার চরম নিদর্শন হিসেবে বিখ্যাত পুলম্যান (Pullman) কোচের সৃষ্টি হয়েছিল। এই কোচের উদ্ভাবক জর্জ্জ পুলম্যান আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। বর্তমানে পৃথিবীর ২০টি ভাষার অভিধানে পুলম্যান শব্দটির অর্থ, আরামপ্রদ, বিলাসবহুল ও নিরাপদ স্থলযান।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার ও সৌখিনতার জগতে পরিবর্তন আসে। পুলম্যান কোচে যে ধরনের আরামের ব্যবস্থা, জেট যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেল অচল, সেকেলে। সেদিন মানুষের হাতে ছিল অফুরন্ত সময় আর সেইজন্যই বোধহয় রেল ব্যবস্থার উন্নতি হতে এত সময় লেগেছিল।

সে যুগের মানুষ ট্রেনে ক'রে ছুটি কাটাতে যেত বা তীর্থযাত্রায় বেরোত। কিন্তু আজকের যাত্রীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে চায়। তাই উন্নত দেশগুলিতে জনপ্রিয়তার স্বার্থে রেলযাত্রা এখন শুধু আরামপ্রদ নয়, দ্রুততরও বটে। বিমানের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এরা অতি দ্রুতগামী ট্রেনের প্রবর্তন করেছে।

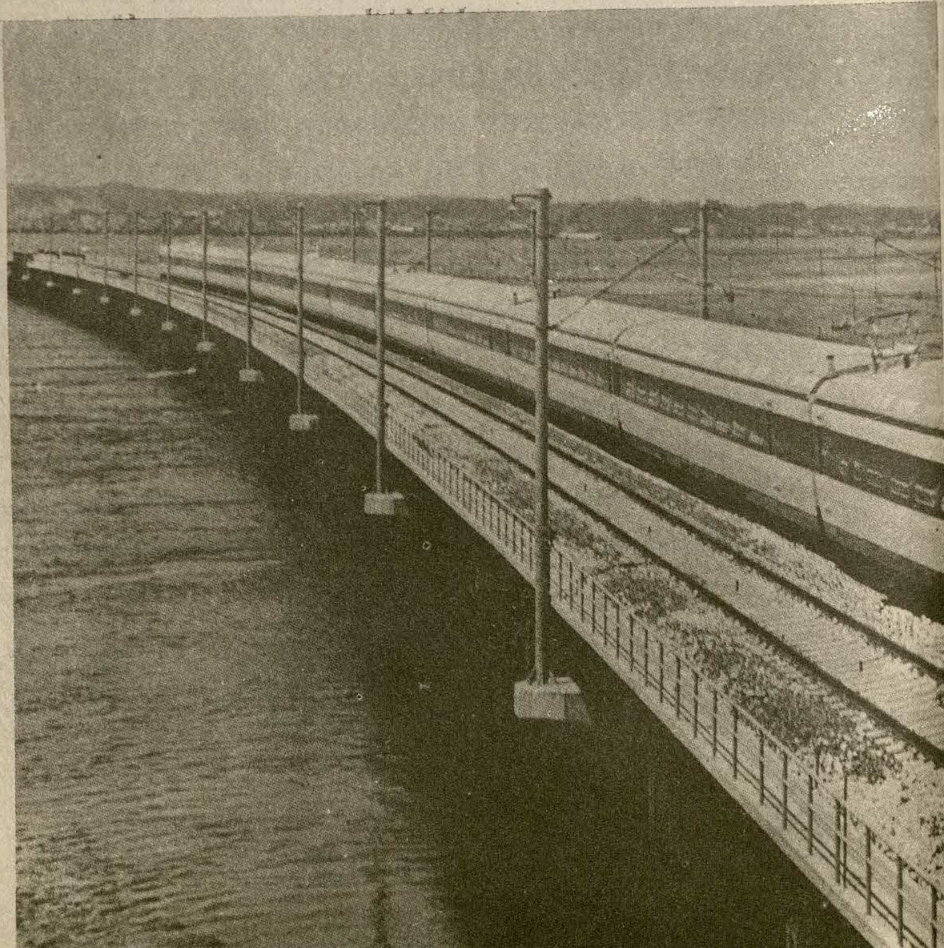
এই চটকদার ট্রেনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাপানী রেলের হিকারী এক্সপ্রেস। চলতি ভাষায় এর নাম বুলেট ট্রেন। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন। নিউ টকাইডো লাইনে ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার বেগে এই ট্রেন চলে। টোকিও ও ওসাকার ভেতর ৫১৫ কিলোমিটার পথ ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিটে অতিক্রম করে। এই ট্রেন খুব ঝকঝকে আর খুব আরামের। এর বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রিত থাকায় টানেলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বাইরের আওয়াজ ভেতরে শুনতে পাওয়া যায় না বলে যাত্রীদের কোন কষ্ট হয় না।

দ্রুতগামী ট্রেনের জন্যে আগাগোড়া নতুন ক'রে নিউ টকাইডো লাইন পাতা হয়েছে। এতে বিশেষ ধরণের গাড়ী ও সর্বাধুনিক পদ্ধতির সিগন্যাল ও ট্রেন কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হয়। তাই এই লাইন তৈরী করতে প্রচুর খরচ পড়ে। মাত্র ৫১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ তৈরী করতে জাপানী ন্যাশনাল রেলওয়ে ৬৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। অর্থাৎ প্রতি কিলো-মিটারে খরচ পড়ে ১.৩ কোটি টাকা। সেখানে ভারতের ৬০ হাজার রুট কিলোমিটার রেলপথে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা বা প্রতি রুট কিলোমিটারে মাত্র ১০ লাখ টাকা। কাজেই নিউ টকাইডো লাইনের প্রতি রুট কিলোমিটারের খরচ ভারতীয় লাইনের তুলনায় ১৩ গুণ বেশী।

ভারতীয় রেলের সীমিত মূলধনে হিকারী এক্সপ্রেসের মত ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান সরঞ্জাম নিয়েই অল্প কিছু খরচ ক'রে ভারতে যে

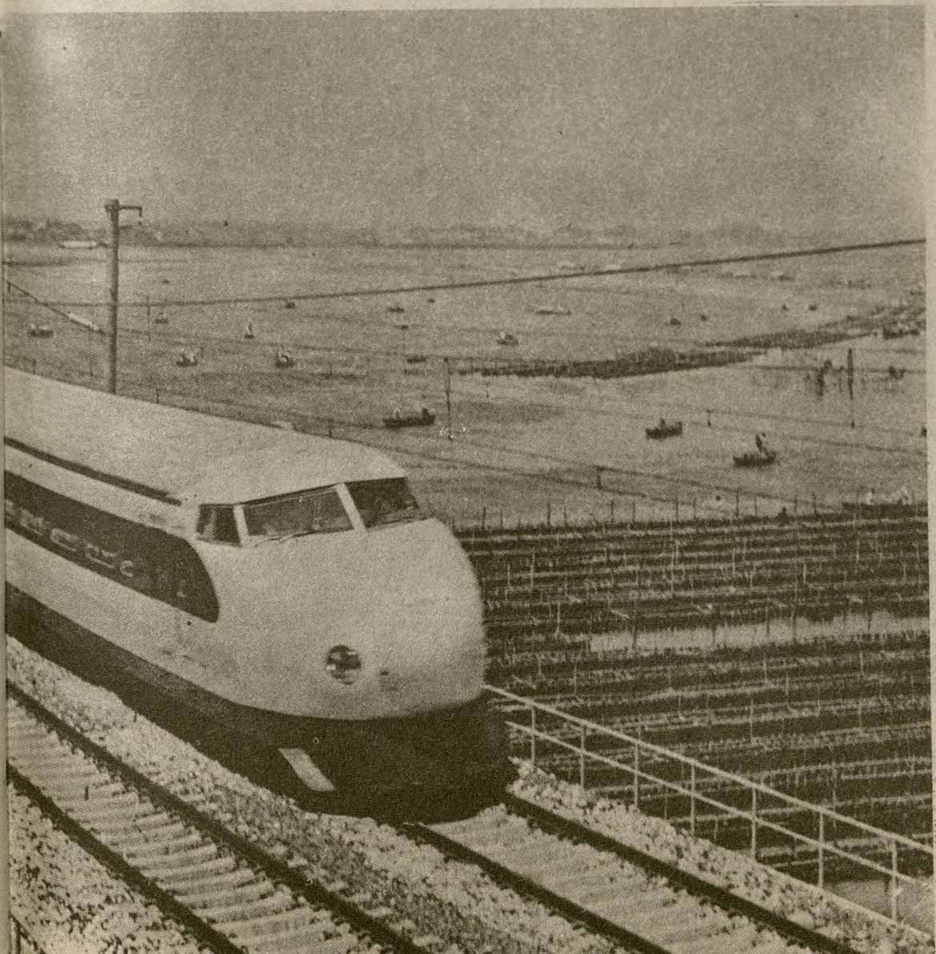
গতিতে ট্রেন চালানো হচ্ছে সেটা প্রথম রেল চালু হবার সময় কল্পনা করা যেতো না।

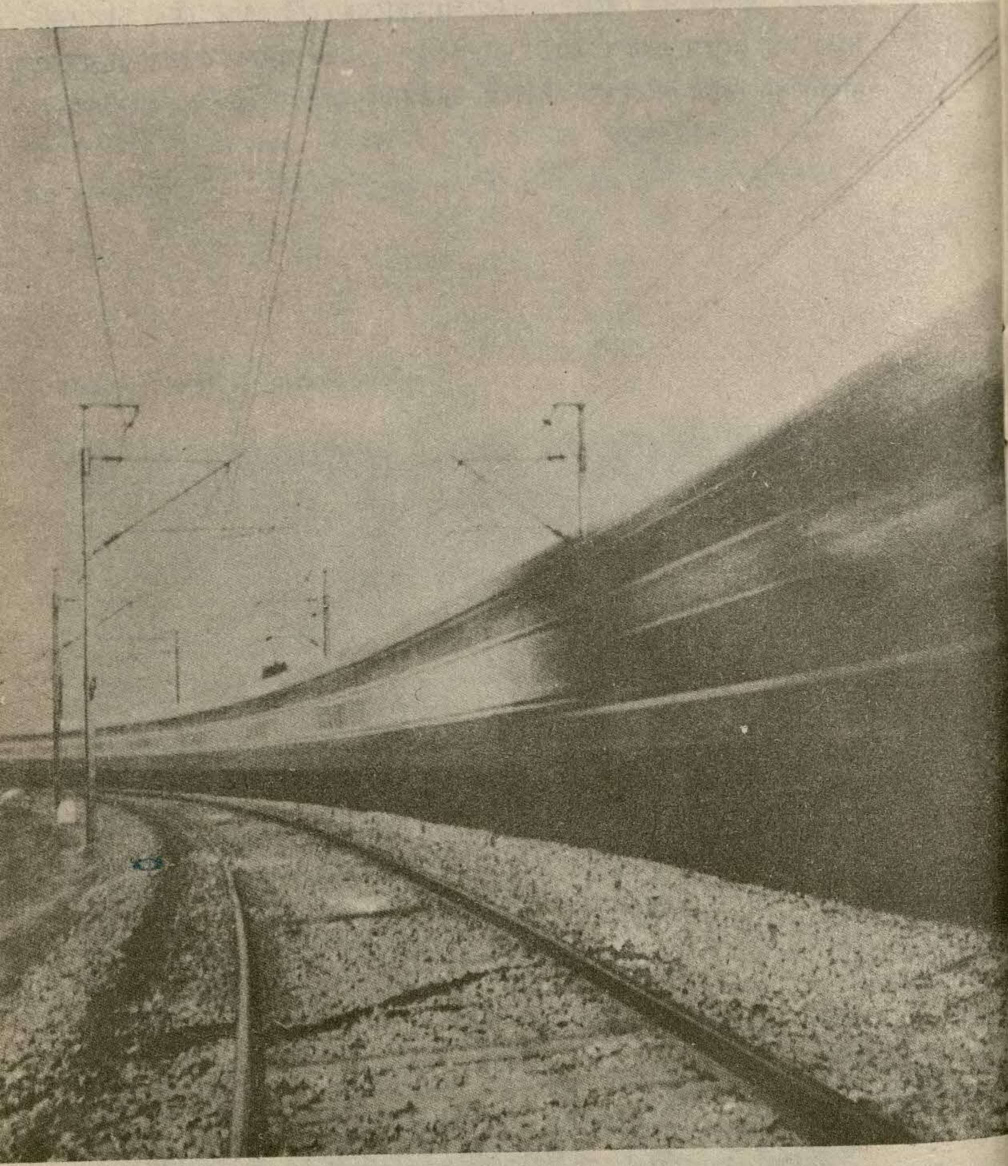
১৯৬৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে উন্নততর পরিচর্যায় রেল লাইন মজবুত করার কাজ শুরু হয়। এর ফলে এক বছরের মধ্যে হাওড়া থেকে নাগপুর অবধি মেন লাইন ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারেরও বেশী বেগে ট্রেন চালানো সম্ভবপর



হচ্ছে। এদেশে ব্রড গেজে ১০০ কিলোমিটারের বেশী বেগে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়, আগে এরকম একটা ধারণা ছিল। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ভারতের সর্বপ্রথম দ্রুতগামী ট্রায়াল ট্রেন চালানো হয়,

পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেন হিকারী এক্সপ্রেস

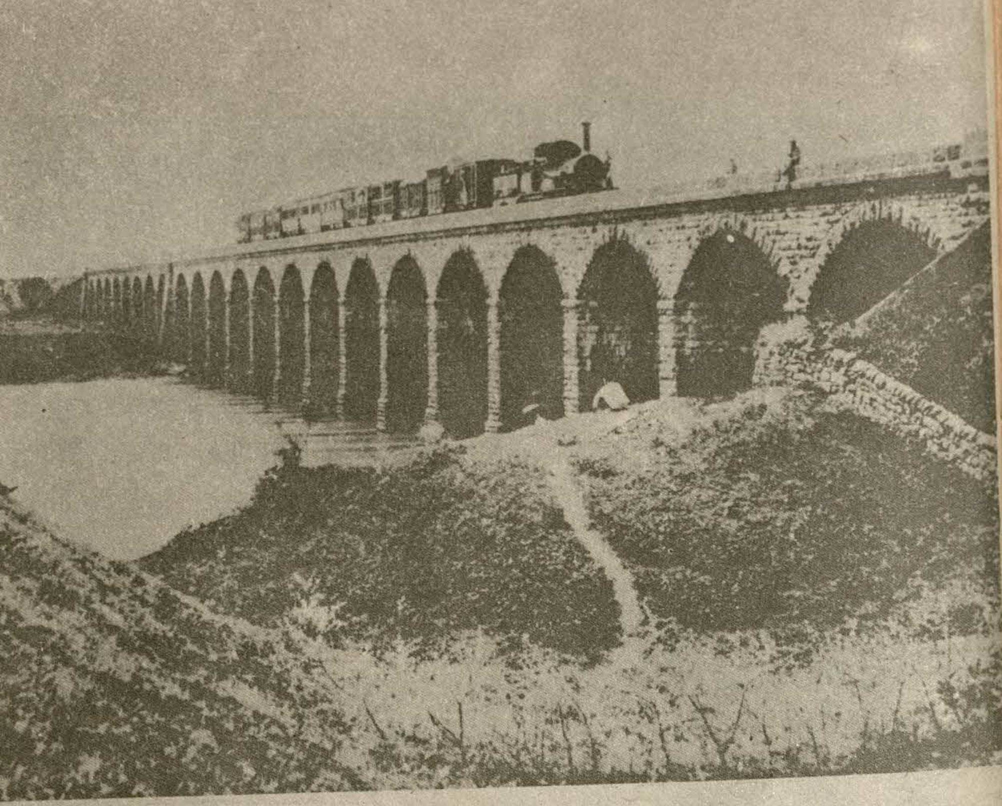




রাজধানী এক্সপ্রেস



এই ট্রেনগুলি ঘণ্টায় ১২৮ কিলোমিটার বেগে চলে। নাগপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত ১,১৩১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সময় নেয় ১২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। আগে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ঐ লাইনের সব চাইতে দ্রুতগামী বোম্বাই মেলের সময় লাগতো ২৪ ঘণ্টা। ট্রায়াল ট্রেনগুলি প্রমাণ করলো যে, ব্রড গেজ লাইনে নামমাত্র খরচ ক'রে ১০০ কিলোমিটারের বেশী বেগে ট্রেন চালানো সম্ভব। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়া ও দিল্লীর মধ্যে অতি দ্রুতগামী রাজধানী এক্সপ্রেস চালানোর জন্যে রেল লাইন মজবুত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১লা মার্চ এই ডি-ল্যুক্স ট্রেনটি চালু হয়। ১,৪৭৫ কিলোমিটার পথ ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিটে অতিক্রম করে রাজধানী এক্সপ্রেস দুই মহানগরীর ভেতর যাত্রার সময় ৬ ঘণ্টা কমিয়ে দিয়েছে। কোন অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োগ করতে হয়নি। অথচ ট্রেনের গতি শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের সাবেকী গণ্ডী পেরোনো সম্ভবপর হল।



ভারতের প্রথম ট্রেন

১৮৫৩ সালের ১৬ইএপ্রিল ভারতের প্রথম ট্রেন বোম্বাই-এর বড়িবন্দর থেকে থানা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার পথ চলে। সেই ভারতীয় রেলওয়ে আজ দেশের সর্ব বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। শুধু দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাত্রীদের নিয়ে যাবার সহজলভ্য পরিবহণ হিসেবেই নয়, দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিতে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার অবদান অসামান্য। তাছাড়া রেলওয়ের মত আর কোন একক প্রতিষ্ঠান এত বেশী সংখ্যক কর্মীকে নিয়োগ করে না।

দুই উপদ্রব

আমাদের প্রধান রেলপথগুলোতে দিনরাত অবিরাম ট্রেন চলে। পূর্ব রেলের গ্র্যাণ্ড কর্ড সেকসনের মত অনেক লাইনে যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যায় ট্রেন চালানো হয়। যে সংস্থা পূর্ণশক্তিতে কাজ ক'রে চলে সামান্যতম উপদ্রবে তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য উপদ্রবও বিরাট অনিষ্টের কারণ। এই অবস্থায় একটি কাজ বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং ঐ প্রতিক্রিয়া দাবানলের মত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু বানচাল ক'রে দিতে পারে।

তোমরা হয়তো গল্প শুনেছ, সামান্য একটা ঘোড়ার নালের জন্যে কিভাবে পুরো রাজ্যটাই হাতছাড়া হয়ে গেল।

নাল নেইতো ঘোড়া গেল,
ঘোড়া নেইতো সওয়ারী গেল,
সওয়ারী নেইতো লড়াই গেল,
লড়াই নেইতো রাজ্য গেল,
নালের অভাবে সবই গেল।

ছোটখাটো ভুলের জন্যে রোজই এই রকম কত রাজ্যই খোয়া যাচ্ছে। তোমরা হয়তো দেখেছ, যানবহুল রাস্তার মাঝখানে ছোট একটি গাড়ী বিকল হয়ে পড়লে দু'ধারের সব গাড়ী ঘন্টার পর ঘন্টা আটকা পড়ে থাকে। আমাদের ট্রেনবহুল ট্রাঙ্ক লাইনগুলির অবস্থাও তাই। এই লাইনগুলিতে সামান্য কিছু ঘটলে সমস্ত ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

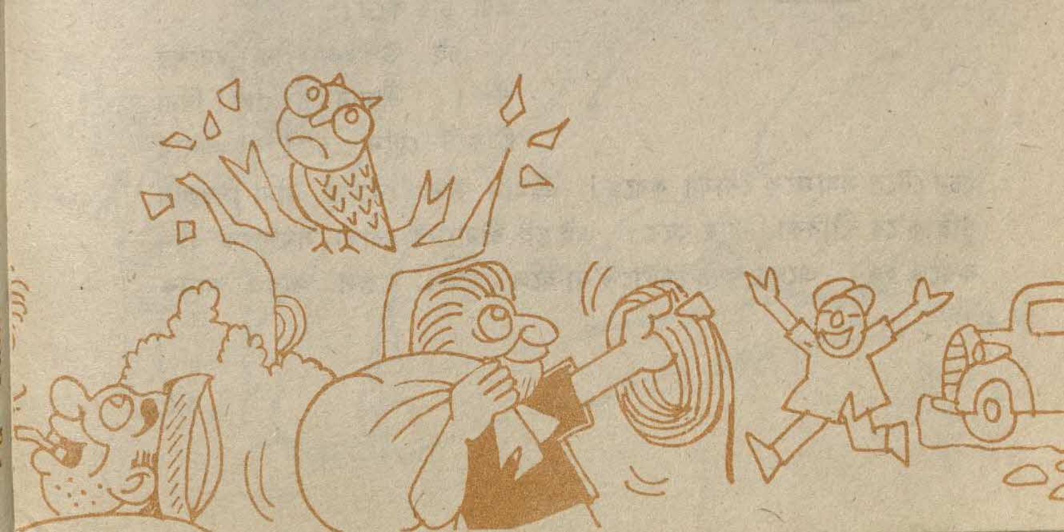
এমন অনেক বিপদ আছে যার বিরুদ্ধে রেল কর্মীরা নিরপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। রেলের সংগঠনের কর্ত্তপক্ষরা সচেতন থাকলে কিছু কিছু বিপর্যয় এড়াতে পারেন। আগে যে



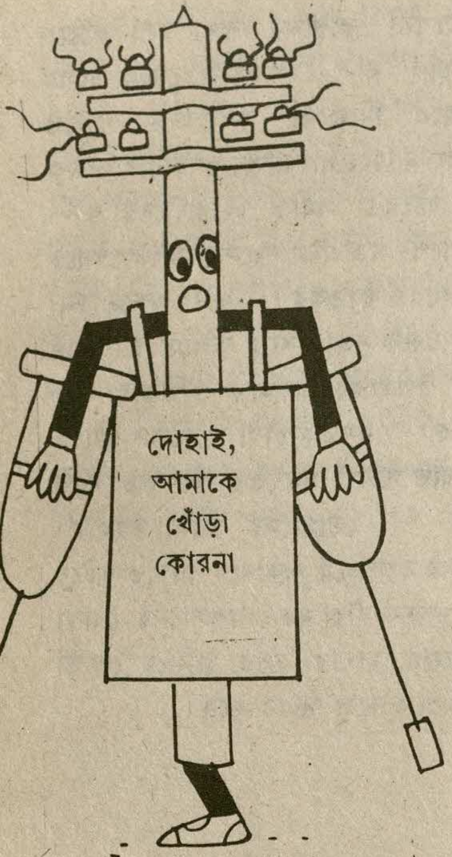




নিরাপত্তা কানুনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি যদি রেলকর্মীরা মেনে চলেন তাহলে নিজেদের ভুলত্রুটিও এড়াতে পারবেন এবং সাংঘাতিক দুর্ঘটনাও অনেক কম ঘটবে। সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপের মত এমন অনেক উপদ্রব আছে যা আরও ক্ষতিকর। এদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে তুলতে পারলেই এই উপদ্রবের একমাত্র প্রতিকার হতে পারে। দুষ্কৃতকারীরা রেলের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে সমাজের যে কত ক্ষতি করে তা তোমাদের জানা দরকার। রেলের কাজকর্মে অকারণে ব্যাঘাত ঘটিয়ে এই দুষ্কৃতকারীরা যত লোকসানের বোঝা সমাজের মাথার ওপর চালিয়ে দেয়তা তোমরা জানলে অবাক হবে।



উপদ্রব হয়ে থাকে। এক, যে-কোন অজুহাতে এলার্ম চেন টানা। বিনা টিকিটের যাত্রী, চেকারের হাত এড়াতে এলার্ম চেন টানে। চোরাই মালের কারবারী চেন টেনে আইনের ফাঁদ এড়াতে চায়। কেউ আবার শুধু নিজের বাড়ীর বা গ্রামের কাছে নামার জন্যে চেন টানে। যে কারণেই হোক, এলার্ম চেন টানলে রেলের ও দেশের আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতি হয়।



দ্বিতীয় ধরনের উপদ্রবগুলি আরও মারাত্মক। সমাজবিরোধী কিছু লোক সব সময় রেলের কিছু না কিছু সাজসরঞ্জাম চুরি করছে। দু'টি স্টেশনের মাঝখানে তামার তার, রিলে, গাড়ীর ব্রেক, ব্লক ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের তার ইত্যাদি এরা চুরি করে।

এই উপদ্রবকারীরা দেশের শত্রু। শ্রীমান্ পরগাছা বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে বা এলার্ম চেন টেনে সমাজকে শোষণ করছে। শ্রীমান তস্কর রেলের নানা সরঞ্জাম চুরি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দুই শ্রীমানের বোঝা সমাজকে বহন করতে হয়। এদের ক্ষতি মেটাতে না হলে রেলের মাশুল আরও অনেক



কম করা চলতো। কাজেই বুঝতে পারছো, তোমার ও আমার পয়সায় কিভাবে শ্রীমান পরগাছা ও শ্রীমান তস্করের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

দুষ্ট কীট যেমন নিকটবর্ত্তী সব কিছুর ক্ষতি ক'রে নিজে বাড়ে, তেমনি শ্রীমান পরগাছা ও শ্রীমান তস্কর সমাজের ক্ষতি ক'রে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করে। এরা দুষ্ট কীট বই আর কিছু নয়।

এদের পরিচয় তো এখন পেয়ে গেলে; তোমরা এদের স্বরূপ সবার কাছে স্পষ্ট ক'রে তোল। আমরা প্রত্যেকেই যদি এই বিঘ্নকারীদের বাধা দিতে সচেষ্ট হই তাহলে রেলের ভাড়া অনেক কমে যাবে এবং তাতে দেশের মঙ্গল হবে।

